স্বস্তিকা

দাম : ষোলো টাকা

শীত ও শীতের পরের রোগের চিকিৎসা
— পৃঃ ২০

অর্থনৈতিক জেহাদের বিরুদ্ধে যোগী আদিত্যনাথের পদক্ষেপ
— পৃঃ ১০

৭৬ বর্ষ, ১১ সংখ্যা।। ৪ ডিসেম্বর, ২০২৩।। ১৭ অগ্রহায়ণ - ১৪৩০।। যুগাব্দ - ৫১২৫।। website : www.eswastika.com

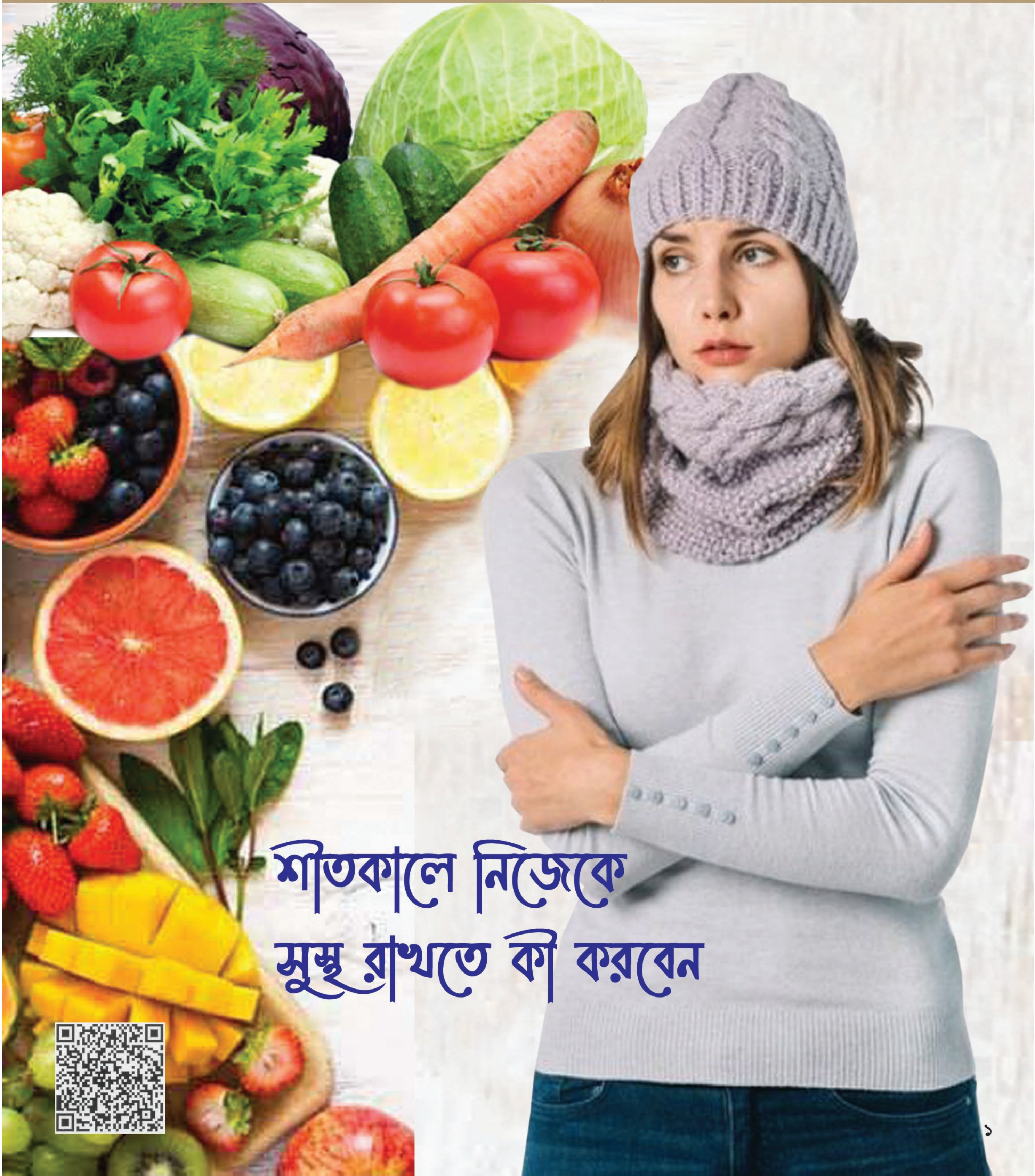

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৬ বর্ষ ১১ সংখ্যা, ১৭ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

৪ ডিসেম্বর - ২০২৩, যুগাব্দ - ৫১২৫,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ☐ ৫

চক্রব্যূহে অভিষেক, চলছে ভানুমতী আর ভাঁওতাবাজির খেল
☐ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ☐ ৬

দিদির পোলাওয়ে অনেক ঘি, কাজু-কিশমিশ নেই
☐ সুন্দর মৌলিক ☐ ৭

জাতীয় সুরক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে এক বৈপ্লবিক উত্তরণ
☐ জে. জগন্নাথন ☐ ৮

অর্থনৈতিক জেহাদের বিরুদ্ধে যোগী আদিত্যনাথের পদক্ষেপ
☐ ডাঃ রবীন্দ্রনাথ দাস ☐ ১০

অগ্নিযুগের বঙ্গের বিপ্লবীরা ইংরেজ শাসনের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছিলেন
☐ অমিত চৌধুরী ☐ ১৩

বাঙ্গালি বিপ্লবীর স্মৃতি-তর্পণ ☐ শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী ☐ ১৫

শক্তিশালী ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন বিপ্লবী পুলিনবিহারী
☐ বিশ্বরঞ্জন দাস ☐ ১৭

রাইটার্সের অলিন্দ যুদ্ধ ও বাঙ্গালির সংজ্ঞা
☐ মিলন খামারিয়া ও ড. কল্যাণ চক্রবর্তী ☐ ১৮

শরীরকে সারা বছর চাঙ্গা রাখার চাবিকাঠি শীতের শাকসবজি ও ফল
☐ মীনাক্ষী মজুমদার ☐ ২৩

শীতকালে ত্বককে সুস্থ রাখতে প্রচুর জল ও সাদামাটা খাবার খান
☐ ডাঃ ইমরান ওয়ালী ☐ ২৪

শরীরের গরমই পারে শীতকালের সমস্যা থেকে রক্ষা করতে
☐ ডাঃ অরিন্দম বিশ্বাস ☐ ২৬

শীতকালে প্রচুর পরিমাণে লেবু আর আমলকি খেতে হবে
☐ ডাঃ দেবাশিস পাহাড়ি ☐ ২৭

প্রচণ্ড শীতে সুস্থ থাকার সহজ উপায় ☐ ডাঃ নূপুর বিশ্বাস ☐ ২৮

শীতকালে দাঁতের সমস্যা এড়ানোর সহজ কয়েকটি উপায়
☐ ডাঃ দীপ্তশঙ্খ চক্রবর্তী ☐ ২৯

সন্তকথা : দুর্গাপ্রসন্ন পরমহংসদেব ☐ কল্যাণ গৌতম ☐ ৩১

বিস্মৃতির অন্তরালে বঙ্গের নবজাগরণের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র অক্ষয় কুমার দত্ত ☐ অধ্যাপক (ড.) স্বাগত বসু ☐ ৩২

বর্ধমানের বিখ্যাত দুই মিষ্টি সীতাভোগ ও মিহিদানা
☐ শেখর সেনগুপ্ত ☐ ৩৪

শীতে শরীরের সমস্যাকে প্রতিরোধ করে শরীর নিজেই
☐ ডাঃ উত্তম মজুমদার ☐ ৩৫

শীতে জল পানের মাত্রা ঠিক রাখতে হবে ☐ সৌরভ সিংহ ☐ ৩৬

বাঙ্গালির বিপ্লব সাধনা ☐ অংশুমান গঙ্গোপাধ্যায় ☐ ৪৩

রামমন্দির : ভারতবাসীর দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পূরণ
☐ তরুণকুমার পণ্ডিত ☐ ৪৫

পাকিস্তানে ধ্বংস সতীপীঠ ☐ বিশ্বামিত্র ☐ ৪৭

নিয়মিত বিভাগ :

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ☐ অঙ্গনা : ২১ ☐ সুস্বাস্থ্য : ২২ ☐ সমাবেশ সমাচার : ৩০ ☐ খেলা : ৩৮ ☐ রঙ্গম : ৩৯ ☐ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ☐ স্মরণে : ৪৮ ☐ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৯-৫০

ফঃ ১

প্রকাশিত হবে ১১ ডিসেম্বর, ২০২৩

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ১১ ডিসেম্বর, ২০২৩

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

চার ট্রিলিয়ন ডলার অর্থনীতিতে প্রবেশ করল ভারত

ভারত ৪ লক্ষ কোটি ডলারের অর্থনীতি অতিক্রম করল। ভারতের পক্ষে নিঃসন্দেহে এটি একটি মাইল ফলক। দেশবাসীর আশা, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাত ধরেই ভারত পরিণত হবে এশিয়ার বৃহত্তম অর্থনীতিতে। অর্থনীতিবিদদের মতে, এর ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারতের অগ্রগতি ত্বরান্বিত হবে। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় এ বিষয়েই আলোকপাত করবেন বিমল শঙ্কর নন্দ, সুদীপ্ত গুহ, ড. রাজলক্ষ্মী বসু, ড. কুণাল ভট্টাচার্য।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :

INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market Kolkata-700 006**

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে। সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীর নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন এবং আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেকSubhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

Bank A/c --- 103502000100693

IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

শীতের সম্ভার

বাঙ্গালিদের নিকট শীত বড়ো আদরের। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-সহ বহু কবি অন্যান্য ঋতুর ন্যায় শীতেরও কবিতা রচনা করিয়াছেন। শীতের আমেজ বাঙ্গালিদের ন্যায় আর কেহ বোধহয় এমন করিয়া অনুভব করিতে পারেন না। বাঙ্গালি চিরকালই ভোজন রসিক। তাই বোধহয় শীত নানাবিধ খাদ্যসম্ভার লইয়া বাঙ্গালির দ্বারে উপস্থিত হয়। প্রকৃতিদেবী এই সময় নানাপ্রকার শাকসবজির ডালি সাজাইয়া বসিয়া থাকেন। পল্লীবাঙ্গলার খেজুরগাছগুলিও তাহার রসের হাঁড়ি সাজাইয়া বসিয়া থাকে। শিউলিরা সেই রস গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে লইয়া উপস্থিত হয়। শীতের কুয়াশা ঢাকা সকালে অগ্নিতাপ অথবা রৌদ্রতাপ লইতে লইতে শিশু হইতে বৃদ্ধের সেই হিমশীতল রস পান এক পরিচিত দৃশ্য। শীতের অনেক উৎসবের মধ্যে পৌষপার্বণ হইল উল্লেখযোগ্য। গ্রামবাঙ্গলার সেই উৎসবের চিরন্তন রূপটি কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতায় শ্লেষাত্মক হইলেও সুস্পষ্ট রূপে ধরা পড়িয়াছে।

শীত শুধু খাদ্যসম্ভার লইয়াই হাজির হয় না, পোশাকসম্ভার লইয়াও হাজির হয়। শিশু হইতে বৃদ্ধ রংবেরঙের পোশাকে সজ্জিত হইয়া শীত উপভোগ করিয়া থাকে। শীত-পোশাকের সম্ভার লইয়া সুদূর কাশ্মীর, হিমাচল, তিব্বত, নেপাল, ভুটান হইতে বস্ত্র ব্যবসায়ীরা এই রাজ্যের হাটে-বাজারে এবং শহরের পথে পথে পশরা সাজাইয়া বসিয়া পড়েন। শীতের শেষে সংবৎসরের উপার্জন লইয়া তাহারা নিজ নিজ স্থানে ফিরিয়া যান।

শীতের নানাবিধ সম্ভারে মাতোয়ারা থাকিলেও বাঙ্গালিকে একটি বিষয়ে সতর্ক থাকিতে হয়। তাহা হইল কয়েকটি রোগের সংক্রমণ। এই সময় প্রত্যুষকালে তাপমাত্রা কমিয়া যায় এবং মধ্যাহ্নে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া পুনরায় সায়ংকালে হ্রাস পায়। তাপমাত্রার হ্রাস-বৃদ্ধির কারণে বেশ কিছু রোগের জীবাণু সক্রিয় হইয়া ওঠে। নিয়ম না মানিবার কারণে প্রায় সকলেই সর্দি-কাশিতে আক্রান্ত হইয়া পড়ে। টনসিল ফুলিয়া যায়। হাঁপানি রোগাক্রান্তরা কাবু হইয়া পড়েন। এই সময় রক্ত সংবহনে তারতম্য ঘটিবার কারণে বয়স্কদের হৃদরোগে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা প্রবল থাকে। অস্থিসন্ধির ব্যথায় তাহারা কষ্ট পাইয়া থাকেন। এই সময় আর একটি বিষয়ে সাবধান থাকিতে হয়। তাহা হইল বায়ুদূষণ। শীতকালে সাংঘাতিকভাবে বায়ুদূষণের মাত্রা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। বায়ুদূষণ সমগ্র বিশ্বেই এক ভয়াবহ সমস্যা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার একটি সমীক্ষায় জানা গিয়াছে যে বিশ্বের সবচাইতে দূষিত কুড়িটি শহরের মধ্যে চৌদ্দটিই ভারতে। বিশেষজ্ঞদের মতে, বায়ুতে ভাসমান ধূলিকণার পরিমাণ শীতকালে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। তাঁহাদের মতে, এই সময় সকাল ও সন্ধ্যায় মুখে মাস্ক ব্যবহার অত্যন্ত জরুরি। শীতকালে বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইড, সালফার ডাই অক্সাইডের ন্যায় ক্ষতিকর গ্যাসের মাত্রা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

শীতকাল ভোগ্যপণ্যের প্রাচুর্য লইয়া উপস্থিত হইলেও রোগের আধিক্য কম নহে। এই কথা মনে রাখিয়া সচেতন থাকিলেই শীতকে পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করা যাইবে। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ও পশ্চিমাংশে শীত কিন্তু ক্ষণিকের অতিথি। বেহিসাবি জীবনযাপন করিলে তাহার মূল্য চোকাইতে হইবে। এই রাজ্যের উত্তরাংশে শীতের প্রকোপ অত্যন্ত বেশি। দার্জিলিঙে তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নীচে নামিয়া যায়। উত্তরবঙ্গে সমতলবাসীরাও প্রচণ্ড শীতে জবুথবু হইয়া পড়েন। তাহারা শীঘ্র শীতের অবসান কামনা করিয়া থাকেন। তাহা সত্ত্বেও শীত উপভোগ করিবার ঋতু। পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করিবার জন্য শুধু একটু সচেতনতার প্রয়োজন।

সুভাষিতম্

বহেদমিত্রং স্কন্ধেন যাবৎকালবিপর্যয়ঃ।
অথৈবমাগতেকালে ভিন্দ্যাদ্ঘটমিবাশ্মনি।।

যখন সময় অনুকূলে থাকে না, তখন শত্রুকেও কাঁধে করে বহন করতে হয়। অনুকূল সময় এলে ঘট যেমন পাথরে আছড়ে ভেঙে ফেলা হয়, তেমনই শত্রুকেও নষ্ট করতে হবে।

চক্রব্যূহে অভিষেক

চলছে ভানুমতী আর ভাঁওতাবাজির খেল

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

কথায় বলে আঁতুড়ঘর থেকে কবরখানা— ফ্রম ক্রেডল টু গ্রেভ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই পথেই নিয়ে চলেছেন তৃণমূলকে। দুটি সংখ্যা আগেই রাজ্যপাটে লেখা হয়েছিল তৃণমূলের নতুন তত্ত্ব অভিষেক ধ্বংস। হলো তাই। অভিষেকের স্বাস্থ্যের দোহাই দিয়ে তাকে কর্মীসভা থেকে সরিয়ে রাখলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই অভিষেক ঘনিষ্ঠ বলে জারিত দলের এক মুখপাত্র তাঁর গোঁসা গোপন রাখেননি। তৃণমূলে বৃদ্ধতন্ত্র ভাঙার কাজটা আপাতত স্থগিত থাকছে। লোকসভা ভোটের পর তৃমমূলে বৃদ্ধনিধন যজ্ঞ শুরু হবে। গোয়েন্দা গল্পকার আর্থার কোনান ডয়েল লিখেছিলেন শার্লক হোমসের মস্তিষ্ক যদি অপরাধীর হতো তাহলে কোনো গোয়েন্দা তাঁকে ধরতে পারত না। সর্বোচ্চ আসন থেকে কেউ যদি জেনে বুঝে ভাঁওতাবাজি করে তাকে আটকাতেই হয়।

গত বছর মে মাসে লিখেছিলাম মমতার শিল্প-সার্কাসে একই কুমিরছানা গোনা হয়। এবারের 'খেলায়' নতুন কুমির ৩ লক্ষ ৭৬ হাজার কোটি টাকার শিল্প লগ্নির সম্ভাবনা। গত বারের তুলনায় আনুমানিক ৪২ হাজার কোটি টাকা বেশি। ২০১৫-র পর থেকে দু' লক্ষ কোটির কুমিরছানা এখন তিন লক্ষ কোটিতে পৌঁছেছে। এটা মমতার রোজনামচা যার ভিতর দিয়ে তিনি নিজের আর রাজ্যের ভাবমূর্তি তৈরি করেন। বুঝতে চান না যে তাঁর সেই প্রচেষ্টাকে শিল্প মহল গুরুত্ব দেয় না। তা না হলে এতদিনে রাজ্যে শিল্পের বান ডাকত। তাতে ভেসে যেত প্রশাসনের মদতে তৈরি হওয়া ভুঁইফোঁড় অবৈধ সিন্ডিকেট। টাটা শিল্পগোষ্ঠীর ন্যানো গাড়ি তৈরির কারখানার বিরোধিতা করেছিলেন বিরোধী নেত্রী মমতা। তাতে যতটা ক্ষতি হয়েছিল তার থেকে অনেক বেশি ক্ষতি করেছেন মমতা প্রশাসক হিসেবে। অনৈতিক আর অবৈধ তোলাবাজির সিন্ডিকেটদের বাড়তে দিয়ে।

বিদেশি বাম জমানায় সিপিএমেও একটু অন্য ধরনের সিন্ডিকেট চলত। তার নাম সিটু, দলের শ্রমিক সংগঠন আর কো-অর্ডিনেশন কমিটি আর ফেডারেশন। শিল্পপতি আর ব্যবসায়ীদের ধমকে-চমকে আর ঘেরাও-ধর্মঘট করে এ রাজ্যের শিল্পকে তারা শ্মশানে পরিণত করে। তবে এই সময়ের শিল্প-শ্মশান বানানোর দায়িত্ব মমতার। তাঁর বেশিরভাগ দাবি রয়ে গিয়েছে খাতায়-কলমে। মমতা দাবি করেছেন, সাতবারের শিল্প সম্মেলনে মোট ১৩ লক্ষ কোটি টাকার প্রস্তাব এসেছে। তার ভিতর ১০ লক্ষ কোটি টাকার প্রস্তাব বাস্তবায়িত হয়েছে। আমি হলফ করে বলতে পারি তা প্রমাণ করতে গিয়ে তাঁর 'জো হুজুর' উপদেষ্টা প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র আর এখনকার শশী পাঁজা খাবি খাবেন। সে চেষ্টা তাঁরা করবেন না। করলে তাঁরাও ভাঁওতাবাজ প্রমাণ হয়ে যাবেন। তবে আপাতত সে সব শিকেয় তুলে মমতা ভানুমতীর খেল শুরু করেছেন।

হঠাৎ উবে যাওয়া আই-প্যাক সংস্থার প্রাক্তন কর্তা আবার নতুন করে মমতার পাশে আসছেন। তিনি সুবিধা মতো বিবাগী হন। আবার নিজেই ফিরে আসেন। মহাভারতের চক্রব্যূহে আটকে ছিলেন অভিমন্যু। আর তৃণমূলের চক্রব্যূহে আটকাতে চলেছেন খোদ কর্ণ, এখানে অভিষেক। অভিষেক বধের ওই নাটকে অন্ধ সেজেছেন মমতা। আপাতত তিনি বৃদ্ধচক্রের সঙ্গেই রয়েছেন। ইডি বা সিবিআইয়ের হাতে অভিষেকের গ্রেপ্তার হয়তো অবশ্যম্ভাবী, তাই মমতা আগে থেকেই নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন। পরিস্থিতি বিচারের ভুল বোঝাতে মমতা আগে থেকেই অভিষেকে গ্রেপ্তারের গাওনা গেয়ে রেখেছেন। জানিয়েছেন তাঁর প্রিয় 'বাবু'-কে লোকসভা ভোটের আগেই গ্রেপ্তার করা হবে। দলের মধ্যে অভিষেক বিরোধী বৃদ্ধরা যে অভিষেকের গ্রেপ্তার দেখতে উঁচিয়ে রয়েছেন, আপাতত মমতার ভানুমতীর খেলের ছুরি ভোঁতা হয়ে গিয়েছে।

তৃণমূলের ঘরে চলছে 'খেলা ভাঙার খেলা'। কংগ্রেস ভেঙে মমতা একসময় যে খেলা শুরু করেছিলেন সেই আগুনে এখন নিজেই পুড়তে বসেছেন। এটা দেখার যে রাজ্য বিজেপি কীভাবে মমতার ঘর ভেঙে দেওয়ার খেলাটা শেষ করে। অন্য বিরোধীরা এ রাজ্যে অপ্রাসঙ্গিক। তাই বিজেপি এ রাজ্যের ভবিতব্য। মমতার ঘর ভাঙতে যে সুযোগ তৈরি হয়েছে তার সদ্ব্যবহার তাদেরকেই করতে হবে। এটাই রাজ্য বিজেপির অগ্নিপরীক্ষা। তাতে উত্তীর্ণ হতেই হবে। নচেৎ বিনাশ অনিবার্য।

অন্য বিরোধীরা এ রাজ্যে অপ্রাসঙ্গিক। তাই বিজেপি এ রাজ্যের ভবিতব্য।

দিদির পোলাওয়ে অনেক ঘি, কাজু-কিশমিশ নেই

দিবাস্বপ্নদ্রষ্টাযু দিদি,

চপ শিল্পের প্রবক্তা হিসেবে আপনাকে যাঁরা হ্যাটা দিত তাঁদের কান মুলে দিয়েছেন আপনি। দেখিয়ে দিয়েছেন আসল শিল্পে রাজ্যে কত বিনিয়োগ মানে বিনিয়োগের স্বপ্ন দেখা যেতে পারে। আমি জানি, আপনি সেই বছরের পর বছর ধরে তাজপুরে গভীর সমুদ্রবন্দর, ডেউচা-পাঁচামি, শালবনির জমি নামক কুমিরছানা দেখিয়ে চলেছেন। কিন্তু দিদি আপনার ঘোষণায় যে টাকার অঙ্কটা দিয়েছেন সেটা অপূর্ব। কে যে হিসাব করে দেয় কে জানে! বেশ বিশ্বাসযোগ্য অঙ্ক লেখে।

এবার যেমন বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে আপনার বিশেষ ইংরেজি ঘোষণায় জানা গিয়েছে মোট ৩,৭৬,২৮৮ কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি এসেছে। গত বছর অঙ্কটা ছিল ৩,৪২,৩৭৫ কোটি টাকা। বৃদ্ধি প্রায় দশ শতাংশ। ভাবা যায়! যদিও মূল্যস্ফীতির হিসাব কষলে বৃদ্ধিটা শূন্যও হয়ে যেতে পারে। ঠিকই করেছেন দিদি। আমিও মনে করি স্বপ্নে যখন পোলাও রান্না হবে তখন ঘি ব্যবহারে কার্পণ্য দেখানো উচিত নয়। মণ মণ ঘি ঢালা উচিত। তবে দিদি, কাজু-কিশমিশ ছাড়া পোলাও জমে না। সেটারই বড়ো অভাব। এত যে শিল্পপতিরা এলেন তাঁরা কিন্তু কেউ নিশ্চিত কোনও উৎপাদনশীল বিনিয়োগের কথা বললেন না। যা দিয়ে প্রকৃতপক্ষে কর্মসংস্থান হবে। মুকেশ অম্বানিও তাই। তাঁর অতীতের প্রকল্পগুলিতেই আগামী তিন বছরে বিনিয়োগ হবে বলে জানিয়েছেন। কালীঘাট মন্দির সংস্কার তো আর বিনিয়োগ নয়। আর যেটা বলেছেন সেটা হলো তাঁর সংস্থার রিটেল পোশাকের দোকানগুলোতে এবার থেকে এ রাজ্যের তাঁতের শাড়ি বিক্রি হবে। কিন্তু দিদি, তাতে রাজ্যের মানে সরকারের কী লাভ হবে? যে শাড়ি রাজ্যের সংস্থা তন্তুজ, মঞ্জুষায় বিক্রি হওয়ার কথা সেটা রিলায়েন্সের 'ট্রেন্ডস'-এ বিক্রি হলে তো রাজ্যেরই ক্ষতি! যাই হোক, আম্বানি বলে কথা! তিনি বলেছেন অতএব উদ্বাহু নেত্য করা যেতেই পারে।

আবার আদানির কথাই ধরুন। তিনি অতীতে এসে বলে গিয়েছিলেন যে, তাজপুরে সমুদ্রবন্দর বানাবেন। চুক্তিও হয়ে গিয়েছে। আপনি আবার তাজপুর বন্দরে বিনিয়োগের আবেদন জানালেন। কিন্তু দিদি একটিবারের জন্যও বললেন না যে, ইতিমধ্যেই আদানি গোষ্ঠী বলে দিয়েছে তাজপুরে বন্দর বানানো যাবে না। যত খরচ, তত লাভ নেই। তাই তারা মন্দারমণিতে বানাতে চায়। তার জন্য জমি দেখাও শুরু করে দিয়েছে আপনার দল। সেটা আবার নন্দীগ্রামের জেলায়। যেখানে আপনি জমি অধিগ্রহণের বিজ্ঞপ্তি জারি হতেই ধুন্ধুমার বাঁধিয়ে দিয়েছিলেন। এখন ক্ষমতায় বসে এবং নন্দীগ্রামে হেরে সেই জেলাতেই জমি অধিগ্রহণের পরিকল্পনা। সেটা গোপনে গোপনে করে ঠিকই করছেন।

যাইহোক, কাজের কথায় আসি। আপনি জানিয়েছেন অতীতে এমন বাণিজ্য সম্মেলন করে যত টাকা বিনিয়োগ প্রতিশ্রুতি এসেছিল তার অনেকটাই নাকি এসে গিয়েছে। খরচও হয়ে গিয়েছে। কিন্তু কোথায় দিদি? আপনার এক মন্ত্রীভাই সেদিন প্রশ্ন করতে বললেন, 'এসেছে এসেছে, দেখতি পাও না।'

কিন্তু দিদি, আপনার কথামতো যদি গত কয়েক বছরে কোটি কোটি টাকার বিনিয়োগ হয়ে থাকে তবে এ রাজ্যের এত শ্রমিক পরিযায়ী কেন? দেশের যেখানে যেখানে দুর্ঘটনা ঘটে দেখা যায় সেখানে পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিক রয়েছে! এ কেমন কথা দিদি! কিন্তু দিদি আপনি তো জানেন শিল্প আনলে পরিকাঠামো লাগে। রাজ্যের দক্ষিণ থেকে উত্তরে যাওয়ার ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের হাল দেখেছেন। কবে থেকে কেন্দ্র সম্প্রসারণের কথা বলছে কিন্তু আপনি জমি অধিগ্রহণ চাইছেন না। কেন বলুন তো! আমি যদিও বিশ্বাস করিনি তবে একজন বলছিল যে, ওই রাস্তা সম্প্রসারণের জমি নিতে গেলে দুধেল গাইদের জমিতে হাত পড়বে। সত্যিই কি তাই!

পুরনো কথা থাক। এবার প্রায় পৌনে চার লক্ষ কোটি টাকার প্রস্তাব এসেছে। মানে অনেক ঘি দিয়ে পোলাও রান্না হবে। কিন্তু উনুনে চাপাতে হবে তো! গন্ধ না বের হলে বিশ্বাস করব কী করে যে পোলাওটা স্বপ্নের নয়, সত্যির।

দিদি, আমি বলি কী, গত বছর বা তার আগের বছরের বাণিজ্য সম্মেলনে প্রস্তাবিত বিনিয়োগের মধ্যে কোথায় কোথায় কাজ হয়েছে, বা অন্তত কাজ এগিয়েছে খানিক দূর, কত লোক কাজ পেলেন, কত লোক পেতে পারেন সেই সব তথ্য পেশ করে দিন। সমালোচকদের মুখে কালি লেগে যাবে। সরকার আরও লগ্নি টানার জন্য কী কী করছে, সে তথ্যও জানান। বাম-আমলে ঋণের বোঝা আর ল্যান্ড ব্যাংক তৈরির কথা এক দশক ধরে শুনতে শুনতে কান পচে গিয়েছে। দিদি, বিজেপির রাজ্যগুলো গত কয়েক বছরে নতুন বাণিজ্য নীতি প্রকাশ করেছে। আপনিও সেটা করুন না। কাউকে বলুন বানিয়ে দেবে। সেসব কিছুই না থাকায় আমার মতো ভাইয়ের পক্ষে আপনার হয়ে লড়াই করা কঠিন হয়ে যাচ্ছে। আসলে জানেন দিদি, রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়াই, চায়ের দোকানে আড্ডা মারি তো! সেখানে সবাই বলছে, সবই ঢপের চপ। বাণিজ্য সম্মেলন আসলে বার্ষিক মোচ্ছব। ❑

জানেন দিদি, রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়াই, চায়ের দোকানে আড্ডা মারি তো! সেখানে সবাই বলছে, সবই ঢপের চপ। বাণিজ্য সম্মেলন আসলে বার্ষিক মোচ্ছব।

অতিথি কলম

জে. জগন্নাথন

জাতীয় সুরক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে এক বৈপ্লবিক উত্তরণ

অদূর ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক প্রতিরক্ষা বাজারে বিশ্বব্যাপী প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম সরবরাহকারীর (global supplier) স্বীকৃতি লাভ করবে ভারত। স্বীয় শক্তি ও প্রযুক্তিগত ক্ষমতার প্রভাবে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে অচিরেই এরূপ একাধিক নজির গড়তে চলেছে ভারত।

ইদানীং 'স্টার্ট আপ' হলো কর্পোরেট জগতে বহুল পরিচত ও ব্যবহৃত একটি শব্দ। এই 'স্টার্ট আপ' শব্দটি নতুন ধরনের ব্যবসায়িক উদ্যোগসমূহের পরিমাপযোগ্য ও উদ্ভাবনী দিকটিকে তুলে ধরে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই স্টার্ট আপগুলি বাজার অর্থনীতিতে আধুনিক ও অভিনব সমাধানের প্রচেষ্টারত এবং অর্থনৈতিক বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিচালিত সম্ভাবনাময়, নবীন ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।

বিগত কয়েত বছরে ভারত নিজের বৃহৎ অভ্যন্তরীণ বাজার এবং দক্ষ শ্রমশক্তির দরুন স্টার্ট আপ সমূহের বিকাশের ক্ষেত্রে একটি গ্লোবাল হাব বা আন্তর্জাতিক কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। সাধারণত, এই স্টার্ট আপগুলি চিরাচরিত, বড়ো শিল্পসমূহের সঙ্গে রীতিমতো পাল্লা দিয়ে, বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হলে, সে সবের উদ্ভাবনী সমাধান হাজির করতে সক্ষম। বিশ্বের মধ্যে দ্রুত হারে প্রগতিশীল ও অন্যতম বৃহৎ স্টার্ট আপ ইকোসিস্টেম হিসেবে ভারত আজ আত্মপ্রকাশ করেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে প্রচলিত— 'স্টার্ট আপ ইন্ডিয়া' ও 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া'র মতো প্রকল্পের বাস্তবায়নের ফলে দেশ জুড়ে বিনিয়োগকারী, ব্যবসায়িক পুঁজি (ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফান্ড), ইনকিউবেটর ও অ্যাক্সিলারেটর সংস্থার সংখ্যা ও পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। নতুন উদ্যোগ এবং উদ্ভাবনী প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে এই প্রকল্পগুলি গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এছাড়াও, স্টার্ট আপগুলিতে অর্থলগ্নিকারী কিছু বিশেষ সংস্থা ও ইনকিউবেশন কেন্দ্র স্থাপিত হওয়ার মাধ্যমে ব্যবসায়িক ক্ষেত্র সমূহে প্রয়োজনীয় সম্পদ আহরণ নবীন উদ্যোগপতিদের পক্ষে সম্ভবপর হয়েছে, যা তাদের চিন্তাধারাকে ব্যবসায়িক সাফল্যে রূপান্তরে সহায়ক হয়েছে। ভারত জুড়ে এই স্টার্ট আপ তন্ত্রের সামগ্রিক বৃদ্ধি সত্ত্বেও বহু স্টার্ট আপ এখনও নানা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন।

সব ক'টি ক্ষেত্রের মধ্যে, প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল, সংশ্লিষ্ট স্টার্ট আপ সমূহ— ভারতে বড়ো মাপের শক্তিশালী প্রতিরক্ষা শিল্পকেন্দ্র গড়ে তোলার মূল কারিগর রূপে আবির্ভূত হয়েছে। ক্রমবর্ধমান সাইবার বিপদ ও সম্ভাব্য বিপর্যয়ের আশঙ্কা এবং উন্নত প্রতিরক্ষা প্রযুক্তির বিপুল চাহিদার কারণে এই স্টার্ট আপগুলিও উদ্ভাবনী শক্তি প্রয়োগে সামরিক ক্ষেত্রের উপযোগী অত্যাধুনিক প্রযুক্তিগত সমাধানে সহায়ক হয়েছে। এর মধ্যে অধিকাংশ স্টার্ট আপ ভারতে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে আবির্ভূত চ্যালেঞ্জ সমূহের মোকাবিলায়— সাইবার নিরাপত্তা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স / এ.আই), ড্রোন প্রযুক্তি ও অত্যাধুনিক নজরদারি ব্যবস্থা (অ্যাডভান্সড্ সার্ভাইল্যান্স সিস্টেম)-র উন্নতিতে গুরুত্ব আরোপ করেছে। তাদের এই কৃতিত্বে ভারতের শক্তিশালী জাতীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা গঠন ছাড়াও তাদের অবদান বিশ্ব প্রতিরক্ষা বাজারেও উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তারে সক্ষম।

প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে আমদানি নির্ভরতা হ্রাসে এই স্টার্ট আপগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। বিগব্যাং বুম সলিউশনস্ (দেশীয় প্রতিরক্ষা প্রযুক্তির উন্নয়নে পারঙ্গম একটি চেন্নাই-কেন্দ্রিক স্টার্ট আপ সংস্থা), টোন্বো ইমেজিং টেক্ (সামরিক ক্ষেত্রে প্রয়োগের উপযোগী উন্নত ইমেজিং ও নজরদারি ব্যবস্থা নির্মাণে দক্ষ একটি সংস্থা), আইডিয়া ফোর্জ (ড্রোন বা আনম্যানড্ এরিয়াল ভেহিকল্ উৎপাদনে অগ্রণী সংস্থা) এবং আলফা ডিফেন্স (প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে সাইবার নিরাপত্তা সুনিশ্চিতের লক্ষ্যে ক্রিয়াশীল একটি স্টার্ট আপ সংস্থা) ইত্যাদি হলো ভারতে শীর্ষ স্থানাধিকারী, প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে সক্রিয় কয়েকটি স্টার্ট আপ সংস্থা।

এছাড়াও 'অটল ইনোভেশন মিশন'-এর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের তরফে ঘোষিত 'ডিফেন্স ইন্ডিয়া স্টার্ট আপ চ্যালেঞ্জ'-এর মতো প্রকল্প প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের প্রতি আগ্রহী স্টার্ট আপগুলিকে পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা ও সহায়তা দান করছে। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে উন্নত ব্যবস্থা নির্মাণে কার্যকর কিছু আদর্শ সংস্থার নিদর্শন (functional prototypes) সৃষ্টি ছাড়াও, তাদের দ্বারা উৎপাদিত ও প্রসূত প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা ক্ষেত্রের উপযোগী পণ্য ও সমাধানের বাণিজ্যিকীকরণও এই সকল সরকারি প্রকল্পের লক্ষ্য। এই প্রতিরক্ষা-বিশেষজ্ঞ স্টার্ট আপ সংস্থা সমূহ জাতীয় প্রতিরক্ষা শিল্পে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে এবং এই শিল্পবিপ্লব— সাইবার সুরক্ষা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ড্রোন প্রযুক্তি ও নজরদারি ব্যবস্থা নির্মাণের ক্ষেত্রে উদ্ভূত যাবতীয় চ্যালেঞ্জ প্রতিরোধে সক্ষম।

প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ ক্ষমতাধর ও স্বনির্ভর দেশ গঠনের উদ্দেশ্যে ভারত সরকারের দ্বারা গৃহীত 'আত্মনির্ভর ভারত' ও 'মেক ইন ইন্ডিয়া'র মতো ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প— প্রতিরক্ষা গবেষণা, উদ্ভাবনীশক্তি ও প্রভূত প্রযুক্তিগত উন্নতির মূল সোপান। দ্রুত পরিবর্তনশীল বর্তমান বিশ্বে, প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত ভারতীয় স্টার্ট আপ সমূহ— প্রতিরক্ষা ক্ষেত্র যে সব চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন, তা নিরসনে অসাধারণ উদ্ভাবনী শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে অত্যাধুনিক ও কার্যকরী

সমাধান (cutting edge solutions) সৃষ্টি অব্যাহত রেখেছে।

ভারতের প্রতিরক্ষা প্রস্তুতি

বিগত ১০ বছরে অভূতপূর্ব সংস্কারের সাক্ষী থেকেছে ভারতীয় প্রতিরক্ষা ক্ষেত্র। সীমান্তবর্তী দুই পরমাণুশক্তিধর বৈরী-মনোভাবপন্ন প্রতিপক্ষের সম্মুখীন হয়ে, উদীয়মান সামরিক শক্তি হিসেবে প্রতিনিয়ত উদ্ভূত সংকট মোকাবিলায় খোলনলচে পালটে প্রযুক্তিগত আধুনিকীকরণ এবং সেনাবাহিনীকে ঢেলে সাজানোর বিশেষ প্রয়োজন ভারতের ছিল। সদাতৎপর ও শক্তিশালী সামরিক বাহিনী গঠনে প্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। যদিও, স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী অধ্যায়ে ভারতীয় প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের বেশিরভাগটাই ছিল আমদানির ওপর নির্ভরশীল। এই দুর্বলতার কারণে ভারতের প্রতিরক্ষা প্রস্তুতির ক্ষেত্রে বিস্তৃত হয় বহিরাগত প্রভাব। প্রধানমন্ত্রীর দ্বারা গৃহীত 'মেক ইন ইন্ডিয়া'র অন্তর্গত, সেনা প্রস্তুতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ দুইটি প্রকল্প— ভারতীয় প্রতিরক্ষা উৎপাদন ক্ষেত্রে নিয়ে এসেছে প্রযুক্তিগত বিপ্লব।

প্রথমত, ১০০ শতাংশ প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই)-এর সিদ্ধান্তের দরুন দেশীয় ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানিগুলির সঙ্গে যৌথ সহযোগিতায় এয়ারবাস ও লকহিড মার্টিনের মতো বড়ো মাপের ডিফেন্স ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানিগুলি ভারতীয় প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম উৎপাদন ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই বিনিয়োগ করেছে। ভারতীয় বিমান বাহিনীর অধীন— অভ্র কার্গো প্লেনের পুরনো মালবাহী বিমানবহর পরিবর্তনের জন্য প্রায় ২ বিলিয়ন ডলার চুক্তির লক্ষ্যে টাটা সন্স ও ইউরোপের এয়ারবাস গ্রুপ একটি যৌথ প্রস্তাব পেশ করেছে। মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রার মতো অটোমোবাইল (মোটরগাড়ি নির্মাণ) শিল্পের সঙ্গে যুক্ত কোম্পানি বিদেশি প্রতিরক্ষা শিল্পগোষ্ঠীর সহযোগে আগ্নেয়াস্ত্র, অস্ত্র ব্যবস্থা (weapon systems) ও সাঁজোয়া গাড়ি নির্মাণে উদ্যোগী হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পক্ষেত্রের সঙ্গে অস্ত্র কারখানা (ordnance factories) গুলির সংযুক্তি (merger)-র দরুন জাতীয় প্রতিরক্ষা শিল্প সমূহ বিশ্ব প্রতিরক্ষা বাজারে যে কোনো সহযোগিতা বা প্রতিযোগিতায় আজ প্রস্তুত। তরুণ মস্তিষ্কের উদ্ভাবনীশক্তিকে কাজে লাগাতে অনেকগুলি আইআইটি-তে তৈরি হয়েছে স্টার্ট আপ ইনকিউবেশন সেন্টার। ড্রোন ও এ.আই (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা) হলো উদীয়মান, বিপদ-প্রতিরোধী প্রযুক্তি (disruptive technology), যা যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি পরিবর্তনে সক্ষম। যুদ্ধের ফলাফলকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ এবং ড্রোন প্রযুক্তির অভাবনীয় কার্যকারিতা প্রদর্শনের সাম্প্রতিক উদাহরণ হলো— রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ। বর্তমানে একটি ড্রোন উৎপাদন কেন্দ্র (ড্রোন ম্যানুফ্যাকচারিং হাব) রূপে ভারত আত্মপ্রকাশ করেছে এবং ২০৩০-এর মধ্যে এই শিল্পে শীর্ষস্থান অধিকারের ক্ষমতাসম্পন্ন দেশ রূপে ভারত পরিগণিত হচ্ছে। একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতে বিগত একবছরে ড্রোন স্টার্ট আপ বৃদ্ধির পরিমাণ— ৩৫ শতাংশ। থ্রটল্ এয়ারোস্পেস সিস্টেম নামক একটি বেঙ্গালুরু ভিত্তিক ড্রোন স্টার্ট আপ কোম্পানি মিলিটারি ড্রোন উৎপাদনের অনুমতিও পেয়েছে।

প্রতিষ্ঠিত প্রতিরক্ষা সংস্থাসমূহের সঙ্গে যৌথ সহযোগিতা

ভারতে প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি ক্ষেত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট স্টার্ট আপের সংখ্যা দ্রুত হারে বাড়লেও, তারা প্রতিদিন নানা রকমের ঝুঁকি ও চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়ে চলেছে। সমস্যাগুলির সমাধানকল্পে, আইআইটি ও এনআইটি-র মতো প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাক্ষেত্রে উদ্ভাবনী অনুশীলনের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক একাধিক প্রকল্প গ্রহণ করেছে। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বেসরকারি কোম্পানিগুলি এ.আই ও ড্রোনের মতো ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি সংক্রান্ত, উদ্ভাবনমূলক গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার লক্ষ্যে নিজস্ব গবেষণাগার নির্মাণ করছে। উদাহরণস্বরূপ, ভারতে প্রতিরক্ষা উৎপাদনে শীর্ষস্থানীয় শিল্পসংস্থা— ভারত ফোর্জের দ্বারা প্রচুর অর্থ বিনিয়োগে নিজস্ব প্রতিরক্ষা গবেষণা কেন্দ্র, 'কল্যাণী সেন্টার ফর টেকনোলজি অ্যান্ড ইনোভেশন' (কেসিটিআই) নির্মাণ। অনুরূপভাবে, মাজগাঁও ডক লিমিটেডের সঙ্গে যৌথ সহযোগিতায় ভারতীয় নৌসেনার ভবিষ্যৎ নৌসম্পদ নির্মাণরত সংস্থা— লারসেন অ্যান্ড টুব্রো, বি.এ.ই সিস্টেমসের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে প্রতিরক্ষা গবেষণাতেও পুঁজি বিনিয়োগ করেছে।

পরিশেষে

সাম্প্রতিক রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এবং হামাস-ইজরায়েলের সশস্ত্র লড়াই বৃহৎ প্রতিরক্ষাশক্তিসম্পন্ন রাষ্ট্রসমূহ-কেন্দ্রিক অবস্থানে, প্রতিরক্ষা উৎপাদনে স্বনির্ভরতা অর্জনের প্রয়োজনীয়তাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। বর্তমানে, সুবৃহৎ প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম উৎপাদন প্রকল্প ও গবেষণালব্ধ প্রযুক্তির দৌলতে আন্তর্জাতিক প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম সরবরাহকারী বাজার রাশিয়া ও চীনের নিয়ন্ত্রণাধীন। প্রধানমন্ত্রী মোদীজীর দূরদর্শী নেতৃত্বে নিজের সক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি উৎপাদন ক্ষেত্রে ভারত আজ দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। গত ৫ বছরেরও কম সময়ে ভারতে প্রতিরক্ষা প্রযুক্তির সম্পর্কিত স্টার্ট আপগুলির শুধুমাত্র সংখ্যাবৃদ্ধি হয়নি, সেখানে বিনিয়োগ এসেছে বিদেশি পুঁজির। এইভাবে প্রতিরক্ষার বিষয়ে যুক্ত এই স্টার্ট আপ সমূহ ভারতের প্রতিরক্ষা প্রস্তুতি ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি সাধন করতে চলেছে এবং এর ফলে অদূর ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক প্রতিরক্ষা বাজারে বিশ্বব্যাপী প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম সরবরাহকারীর (global supplier) স্বীকৃতি লাভ করবে ভারত। এই অমৃতকালে, স্বীয় শক্তি ও প্রযুক্তিগত ক্ষমতার প্রভাবে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে অচিরেই এরূপ একাধিক নজির গড়তে চলেছে ভারত।

(লেখক জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর)

শোক সংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণ বীরভূম জেলার পাঁড়ুই খণ্ডের ভালুকসুন্দা শাখার স্বয়ংসেবক তথা স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের জেলা সংযোজক চিত্তপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়ের পিতৃদেব রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় গত ৯ নভেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ২ পুত্র ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। তিনি একাধারে কবি, সাহিত্যিক ও সমাজসেবী ছিলেন। জনজাতিদের উন্নয়নের জন্য সারা জীবন কাজ করে গেছেন। তিনি সামাজিক সমরসতার জ্বলন্ত উদাহরণ ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে জনজাতি সমাজে শোকের ছায়া নেমে আসে।

অর্থনৈতিক জেহাদের বিরুদ্ধে যোগী আদিত্যনাথের পদক্ষেপ

হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতি বাঁচানোর একমাত্র উপায় দেশে ভারতীয় দণ্ড-সংহিতা, জন্মনিয়ন্ত্রণ ও ভারতীয় নাগরিক সংহিতা বা অভিন্ন দেওয়ানি বিধি অবিলম্বে লাগু করা। এজন্য চাই রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, ইচ্ছাশক্তি ও অদম্য সাহস।

ডাঃ রবীন্দ্রনাথ দাস

আরবিতে হালাল শব্দের অর্থ শুদ্ধ, স্বাস্থ্যকর, পবিত্র বা অনুমোদনযোগ্য। এর বিপরীত শব্দটি হলো হারাম, যার অর্থ অশুদ্ধ, অস্বাস্থ্যকর, অপবিত্র এবং অনুমোদনের অযোগ্য। আজ থেকে ১৪৫০ বছর আগে শাহি-আল-বুখারির বই ৬০, হাদিস ১২৯নং পৃষ্ঠা ৩৪৬২-তে লেখা আছে, শতবর্ষীয় ইহুদি কবি আবু আফাকের কবিতায়, 'পয়গম্বর মোহম্মদই প্রথম অনুমোদিত মানে হালাল আর নিষিদ্ধ মানে হারামের প্রবর্তন করেন।' পয়গম্বর নির্দেশ দেন সেলিমকে ওই বয়োবৃদ্ধ জ্ঞানীকে নির্দয়ভাবে হত্যা করতে। তখন থেকেই শুরু হয় ইসলামের বিপরীত দিশায় চলা। কঠোর কণ্ঠে ঘোষিত হয়, 'ইহুদি, খ্রিস্টান বা মূর্তিপূজকরা যা করবে তার উলটোটা অবশ্যই করতে হবে নব্য মুসলমানদের।' যেমন দাড়ি রেখে গোঁফ কাটা, খাওয়াদাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ, ওঠাবসা এমনকী হাতের লেখাটাও মুসলমানরা উলটো দিক থেকে করে থাকে। শ্রীমদ্ভগবত গীতাতে (১৮/৩২) আছে, 'অধর্মং ধর্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা। সর্বার্থান্ বিপরীতানশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী।' সেকুলারপন্থী, কমিউনিস্ট আর আব্রাহামিক পন্থীদের ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য। জাতিবিদ্বেষ, হিংসা আর ঘৃণা থেকে উৎপন্ন হয়েছে এই ইসলামি মজহব। প্রথমে ইহুদি, পরে খ্রিস্টান এবং সবশেষে প্রতিমা পূজকদের ধ্বংস করে সারা পৃথিবীতে ইসলামের আধিপত্য ও প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করাই হলো এদের মূলমন্ত্র!

হালাল আর হারামের সাহায্যে বিভেদের সৃষ্টি হয়েছে মানুষের মধ্যে। রাজ্যের মধ্যে রাজ্য, শহরের মধ্যে শহর ও গ্রামের মধ্যে গ্রাম সৃষ্টি— এই হচ্ছে ইসলাম! হাজার বছরের দাসত্বে বিদেশি আক্রমণকারীদের কারণে সনাতন ধর্ম ও ভাষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতি আজ হিন্দুরা হারাতে বসেছি। আমরা তো মুসলমান নই তবে হালাল আমাদের উপর কেন লাগু হবে? মুঘল বাদশা ঔরঙ্গজেব ১৬৭৯ সালে হিন্দুসমাজে বিভেদের বীজ বুনেছিল তীর্থযাত্রীদের উপর বিভিন্ন পরিমাণে জিজিয়া কর চাপিয়ে। সেই থেকে সমাজের মধ্যে উচ্চ-নীচের বৈষম্য নিয়ে আসা হয়। অসহায় হিন্দুদের ধর্মান্তরণের জন্যই অর্থনৈতিক চাপের সৃষ্টি করা হয়।

হালাল শুধুমাত্র খাদ্যবস্তুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এই পৃথিবীর সমস্ত কিছুর মধ্যেই আছে হালাল আর হারামের অভিব্যক্তি। শ্রীমদ্ভগবত গীতায় (১৪/৫) যেমন বলা হয় 'সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ' অর্থাৎ জড়প্রকৃতির প্রতিটি বস্তুতেই আছে সত্ত্ব, রজো ও তমো নামক তিনটি গুণের প্রকাশ। অন্ধ ইসলাম অনুসরণকারী মোল্লা-মৌলবিরা ঠিক তেমনই সমস্ত বস্তুর মধ্যে 'হালাল-হারাম' এবং ব্যক্তির মধ্যে 'মুমিন-কাফের' ধারণার জন্ম দিয়ে সমগ্র বিশ্বকে গ্রাস করার ষড়যন্ত্র করে চলেছে গত ১৪৫০ বছর ধরে।

আল্লাকে সাক্ষী রেখে, পশ্চিমে মক্কা-মদিনার দিকে মুখ করে, কোরান থেকে 'বিসমিল্লা-এ-রহমানে রহিম' আয়াত উচ্চারণ করতে করতে নির্দ্বিধায় ধারালো ছুরি দিয়ে নির্দয়ভাবে মানুষ থেকে শুরু করে গোরু, উট, ছাগল, পশুপক্ষীর গলার জুগুলার শিরা ও শ্বাসনালীটি কেটে, নিদারুণ যন্ত্রণা দিয়ে, অর্ধমৃত প্রাণীটির মাথা নীচে রেখে, উলটো দিকে ঝুলিয়ে, একটু একটু করে রক্তশূন্য করে, দেহ থেকে মাথাটা বিচ্ছিন্ন না করে হত্যা করার পদ্ধতিকে বলে হালাল। কোরানের কথায় মদিরা, মৃত জীবের মাংস, অন্যে রক্ত বা রক্তজাত পদার্থ, শুয়োরের মাংস আর ইসলামিক নিয়মে মারা হয়নি এমন প্রাণীর মাংস হলো হারাম।

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখা যাক কতটা স্বাস্থ্যকর এই হালাল প্রক্রিয়ার পশুমাংস। পাশ্চাত্যের খ্রিস্টানরাও পশুহত্যার জন্য মানবিক গুণের প্রয়োগ করে। বিদেশে এমনকী আমাদের দেশেও পশুহত্যার সময় 'আন্তর্জাতিক পশুক্লেশ নিবারক' নিয়ম আছে। পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা আর উত্তরপূর্ব ভারতের রাজ্যগুলি ছাড়া সর্বত্রই 'স্টানিং'

পদ্ধতিতে অজ্ঞান করে পশুটির শরীর থেকে মাথাকে আলাদা করা হয়। এতে যন্ত্রণা অনেক কম হয়। হিন্দু ও শিখরা 'ঝটকা' পদ্ধতিতে ছাগল বা মুরগি কাটে। হালাল পদ্ধতিতে পশুটির চোখের সামনে গলায় ছুরি বসিয়ে জুগুলার শিরা আর ক্যারোটিড ধমনীসহ শ্বাস ও খাদ্যনালী ছিন্ন করা হয় যখন অসহায় পশুটিকে সবাই মিলে চেপে ধরে থাকে। প্রাণীটির দেহ থেকে ফিনকি দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে রক্ত বেরতে থাকে। সামনে দাঁড়িয়ে থাকা শিশু, বৃদ্ধ, দর্শকমণ্ডলীর জিঘাংসাও পরিতৃপ্ত হয়। পক্ষান্তরে, হিন্দুরা ছাগলের মাথা ও ঘাড়ের পিছনে সজোরে ভারী ও সুতীক্ষ্ণ খড়্গের দ্বারা এক ঝটকায় মাথাকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে।

বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন, হালাল পদ্ধতিতে হত্যায় অনেকটা সময় লাগে। ঝটকায় সময় লাগে কয়েক সেকেন্ড মাত্র। যন্ত্রণার অনুভূতি চামড়া থেকে স্নায়ুতন্ত্র দিয়ে স্পাইনাল-কর্ডে আসে। ব্যথা অনুভূত হয় মস্তিষ্কের পেছনে থাকা সেনসরি কর্টেক্সে। মাথা বা ঘাড়ের পিছনে ভার্টিব্রাল-ধমনী সেনসরি কর্টেক্সে রক্তসংবহন করে। ঝটকা পদ্ধতিতে ছাগল কাটলে দেহ থেকে মাথাটা বিচ্ছিন্ন হয়। মস্তিষ্ক ও স্পাইনাল- কর্ডের সংযোগ তৎক্ষণাৎ বিচ্ছিন্ন হয়। মস্তিষ্কে রক্তসংবহনও বন্ধ হয়ে যায় এক লহমায়। ফলে স্নায়ু ও রক্তবাহিত হয়ে যন্ত্রণা নির্দেশক নিউরোট্রান্সমিটারগুলি মস্তিষ্কে না পৌঁছানোর কারণে ব্যথার অনুভূতিও হয় না।

যন্ত্রণাকাতর প্রাণীদেহ থেকে অ্যাড্রিনালিন, ডোপামিন, সেরোটোনিন ও কর্টিসল নামক স্ট্রেস হরমোন নিঃসৃত হয়। আমেরিকান বিজ্ঞানী টেম্পল গ্রান্ডিনের মতে, 'এগুলি মাংসের গুণবত্তাকে নষ্ট করে'। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ঝটকার তুলনায় হালাল পদ্ধতির মাংস তাই নিকৃষ্ট। ভারতও পশুহত্যার আন্তর্জাতিক 'ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড, ২০১১ রেগুলেশন' মানে। রক্তপাতের আগে অজ্ঞান করে তিন থেকে দশ বছরের প্রাণীকে বধ করা হয়। দুগ্ধবতী বা গর্ভবতী প্রাণীকে কিংবা তিনের নীচের

> **'হালাল অর্থনীতি কাফেরদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত জটিল ও জঘন্য প্যান- ইসলামিক এক অর্থনৈতিক ষড়যন্ত্র'! হালাল শুধুমাত্র মাংসের ব্যবসা নয়। এর সঙ্গে জুড়ে থাকা নানা কর্মসংস্থান, প্যাকিং, কেনা-বেচা, বিদেশে রপ্তানি-সহ অন্যান্য সমস্ত কাজেই অমুসলমানদের নেওয়া হয় না। কারণ কাফেরদের স্পর্শে হারাম হবে সেইসব সামগ্রী।**

কম বয়স্ক প্রাণীকে হত্যা আইন বিরুদ্ধ। রাজ্য সরকার মুসলমান ভোটব্যাংক হারানোর ভয়ে ওই মানবিকগুণের মানদণ্ডকে অবজ্ঞা করে বলেই চারিদিকে অসংখ্য অবৈধ কসাইখানা গজিয়ে উঠেছে।

কয়েকদিন ধরে হালাল সার্টিফিকেটের ব্যাপারে রাজনীতির রণক্ষেত্রে তুলকালাম কাণ্ড হয়েছে। হালালের বিরুদ্ধে মামলা শুরু হয় যখন বিশ্ব জৈন সংগঠনের তরফে উকিল রবিপ্রকাশ গুপ্তা কোভিড মহামারির সময়ে সুপ্রিমকোর্টে গোহত্যার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। দ্বিতীয় ঘটনাটি হলো, ২০২০ সালে জামসেদপুরে 'বিশ্ব হিন্দু পরিষদ' অনুমোদিত ফলের দোকানি উদয় সিংহ যখন ফেস্টুনে বিজ্ঞাপন দেয়। ধর্মান্ধ মুসলমান ও তাদের পোষা হিন্দুনামধারী প্রাদেশিক দলের রাজনেতারা এতে সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ পান। ফলে প্রশাসনের চাপে ওই হিন্দুর দোকান বন্ধ হয়ে যায়।

হিন্দু জনজাগৃতি সমিতির মুখপাত্র ও উকিল রমেশ সিন্ধের কথায়, 'হালাল অর্থনীতি কাফেরদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত জটিল ও জঘন্য প্যান- ইসলামিক এক অর্থনৈতিক ষড়যন্ত্র'! হালাল শুধুমাত্র মাংসের ব্যবসা নয়। এর সঙ্গে জুড়ে থাকা নানা কর্মসংস্থান, প্যাকিং, কেনা-বেচা, বিদেশে রপ্তানি-সহ অন্যান্য সমস্ত কাজেই অমুসলমানদের নেওয়া হয় না। কারণ কাফেরদের স্পর্শে হারাম হবে সেইসব সামগ্রী। এখন শাকসবজি, ফলমূল, দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত সমস্ত জিনিসের উপরও লেগে থাকে হালাল সার্টিফিকেট। খাদ্যসামগ্রী ছাড়াও, ওষুধ, খেলনা, ছাতা-জুতা-চপ্পল, পেন, পেনসিল, প্রসাধনী বস্তু, হোটেল, রেস্টুরেন্ট--- সর্বত্র আজ হালালের কোলাহলে। নেস্‌ল, ম্যাকডোনাল্ডস্ আর কেএফসি-র ফ্রায়েড চিকেনেও দেখি হালালের হলাহল! এক প্রতিদ্বন্দ্বীবিহীন ইসলামিক ছায়াযুদ্ধ।

হালাল ট্যুরিজমের নামে পৃথিবীতে কয়েকটি জায়গায় শুধু মুসলমানরাই যায়। সেখানে কঠোরভাবে কোরানের শরিয়া লাগু হয়। মুসলমানদের জন্য থাকে বিশেষ সুবিধা কিন্তু অমুসলমানদের কোনো স্থান হয় না। হালাল সামগ্রী অপেক্ষাকৃত মহার্ঘ্য। তরল সোনা সমৃদ্ধ আরবদেশে হালাল দ্রব্য বেশি দামে বিক্রিও হয়। তাই হালাল সার্টিফিকেটের দর আর কমিশনও বেশি হয়। মধ্যপ্রাচ্যের রপ্তানিতে আইটিসিকে 'আশীর্বাদ-আটা' এবং পতঞ্জলিকে দৈনিক ব্যবহার্য হাজার খানেক দ্রব্যের জন্য বেশি দামে হালাল সার্টিফিকেট কিনতে হয় জিহাদি হালাল ট্রাস্টগুলো থেকে। সেজন্য ভারতে অমুসলমানদেরও হালাল সার্টিফায়েড দ্রব্য কিনতে হয় বেশি দামে। বেশি টাকায় কাফেরদের কিনতে হচ্ছে নিজের মৃত্যুদণ্ড। জেহাদি ট্রাস্টগুলো অবৈধ হালাল সার্টিফিকেট বিক্রি করে, বাজারে কালোটাকা ছড়িয়ে ও ইনফ্লেশন বাড়িয়ে দেশীয় অর্থনীতির সর্বনাশ করছে।

আধুনিক যুগে হালাল ব্যবসা সভ্যতার এক অন্ধকূপের মতো। জমিয়ত- উলেমা-ই-হিন্দ হালাল ট্রাস্ট, হালাল কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড— এইসব মুখ্য

সংস্থাই হালাল সার্টিফিকেট দেয়। অবৈধ সার্টিফিকেট দিচ্ছে এমন সংস্থার সংখ্যা কিন্তু অনেক বেশি। প্রতিটি রাজ্যেই এদের অনেক শাখা রয়েছে। একটা সার্টিফিকেটের মেয়াদ মাত্র এক বছর। ফি-বছর ১০০ থেকে ২০০০ ডলার পর্যন্ত প্রক্রিয়াকরণ ফি জমা দিতে হয় ওইসব সংস্থাকে। প্রতিটি আইটেমের বিক্রিমূল্য এবং লভ্যাংশের উপরও কমিশন দিতে হয় ওইসব সংস্থাকে। অবিশ্বাস্য রকম কালোবাজারি চলে এই হালাল ব্যবসাতে। সমস্ত হালাল-সার্টিফিকেট প্রদানকারী সংস্থাগুলির মানদণ্ড এক রকম হয় না। কালো টাকাকে লাগানো হয় ইসলামের সংরক্ষণ, সম্প্রসারণ ও জেহাদের কাজে। জেহাদ মানে কাফেরদের সঙ্গে অসহযোগিতা ও যুদ্ধ!

দেশে দাঙ্গা লাগানো, অগ্নিসংযোগ, হত্যা, লুট, বলাৎকার, ধর্মান্তরণ, গোরু, নারীপাচার, লাভ ও ল্যান্ড জেহাদ ইত্যাদি সমস্ত নাশকতামূলক কাজে ধর্মান্ধ অসহিষ্ণু মুসলমানরাই অপরাধ করে। জেহাদিরা বাংলাদেশ ও নেপালের সীমানা দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে হিন্দুনারীদের বিক্রি করে। জমিয়াত-উলেমা-ই-হিন্দের প্রধান মহম্মদ আসাদ মাদানি দোষী আসামিদের পক্ষে সুপ্রিমকোর্টের নামিদামি ফৌজদারি উকিল কপিল সিব্বল, অভিষেক মনুসিংভী, প্রশান্ত ভূষণ এবং ইন্দিরা জয়সিংহদের নিয়োগ করে। ২৬ জুলাই, ২০০৮ সালে গুজরাটে বোমা বিস্ফোরণ ঘটায় 'ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন'। আহমেদাবাদের সমস্ত পত্রপত্রিকার সম্পাদককে ধমকানো হয় ই-মেলে। পাঁচ মিনিটেই শুরু হয় সিরিয়াল বিস্ফোরণ। দুটি হসপিটালে একুশটি বোমা ফাটে। মৃত্যু ৫৬ জনের এবং ২০০-র বেশি মারাত্মকভাবে আহত হয়।

বিশেষ আদালতে ৪৯ জন জেহাদি দোষী সাব্যস্ত হয়। ৩০ জনের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় এবং ২৮ জন বেকসুর ছাড়া পায় ওইসব উকিলের কারসাজিতে। কমলেশ তিওয়ারী ও রাজস্থানের কানহাইয়া লালের হত্যাকাণ্ড, মালেগাঁও ব্লাস্ট, ধুলের দাঙ্গা— সর্বত্র মাদানির প্রত্যক্ষ মদত থাকে। ইউপিএ-র ২০০৪ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত ৪ বছরে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ১২টি সন্ত্রাসবাদী হামলা হয়। ২০০৮ সালে মুম্বই হামলায় স্থানীয় মুসলমানদের সাহায্যে ১০ জন পাকিস্তানি সন্ত্রাসবাদী তাজ হোটেলে ১৬৬ জনকে হত্যা করে। 'হিন্দু সন্ত্রাসী' নাম দিয়ে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘকে কলঙ্কিত করে কংগ্রেসের দিগ্বিজয় সিংহ। আজমল কাসভ ধরা পড়ে ষড়যন্ত্রটি ফাঁস করে দেয়। ২০১৪ সালে মোদীজীর আসার পর সব ব্লাস্ট বন্ধ হয়।

ভারতের বৃহত্তম রাজ্য উত্তরপ্রদেশের ২৪ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে ৩.৮ কোটি অর্থাৎ ২০ শতাংশ মুসলমানের বাস। সেই প্রদেশের গেরুয়াধারী কর্মযোগী, পাঁচবারের নির্বাচিত সাংসদ, গোরক্ষনাথ মঠের পীঠাধীশ মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ৫০০ বছর নিরন্তর সংঘর্ষের পর রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য অযোধ্যায় আগামী ২০২৪-এর ২২ জানুয়ারি মর্যাদা পুরুষোত্তম রাজা রামের মূর্তিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে চলেছেন। ধর্মের ভিত্তিতে ত্রিখণ্ডিত ভারতে তিনিই হলেন প্রথম রাজনেতা যিনি ভারতকে ইসলামীকরণের জঘন্য ষড়যন্ত্র থেকে বাঁচাতে পারেন। ভারতের ইতিহাসে এই প্রথম একজন নিঃস্বার্থ, নির্ভীক ও জনসেবক যোগীপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে যিনি আতিক আহমেদ, ইয়াকুব কুরেশি ও মুক্তার আনসারিদের মতো রাজনৈতিক সমর্থনপুষ্ট দাগি অপরাধীদের অবৈধ কসাইখানা এবং হাজার কোটির সম্পত্তি ধূলিসাৎ করার সাহস দেখিয়েছেন।

শৈলেন্দ্র শর্মা গত ১৮ নভেম্বর, ২০২৩ লক্ষ্ণৌয়ের হাজারিগঞ্জ কোতোয়ালিতে এফআইআর দাখিল করেন হালাল সার্টিফিকেট প্রদানকারী সংস্থার বিরুদ্ধে। যোগী আদিত্যনাথ তৎক্ষণাৎ ৮টি অবৈধ হালাল সার্টিফিকেট প্রদানকারী সংস্থাকে অবৈধ ঘোষণা করেছেন। ফলত গোমাংস ও চামড়ার উৎপাদন, গুদামজাত করা ও কেনাবেচা বন্ধ হয়েছে। ব্যাপক খানাতল্লাশিও চলছে।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে হালালের ধারণা অবান্তর। মুমূর্ষু মুসলমানদের শরীরে হিন্দুর রক্ত চালিয়ে জীবন রক্ষা হয়। মুসলমানরা রক্তদান করে না অথচ রক্ত গ্রহণে আপত্তি নেই। অ্যালোপ্যাথি ক্যাপসুলের জিলাটিন তৈরি হয় মৃতপ্রাণীর টেন্ডন ও লিগামেন্ট থেকে। গ্লিসারিন, ভিটামিন, ইনসুলিন, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, বিভিন্ন এনজাইম— সবই আসে বিভিন্ন প্রাণী থেকে। কোভিড ভ্যাকসিনও তৈরি হয়েছিল বাছুরের লসিকারস থেকে। সর্পাঘাত আর টিটেনাসের টিকাও তৈরি হয় অন্য প্রাণীর 'সেরাম' থেকে। তখন মুসলমানদের 'হারামকে'ই গ্রহণ করতে হয়!

ভারতে হালাল অর্থনীতি হচ্ছে সরকারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সমান্তরাল সরকার ও অর্থব্যবস্থা চালানোর প্রয়াস। এর পিছনে আছে 'গাজওয়া-ই-হিন্দ' স্থাপনের দিবাস্বপ্ন। ভারতে ইসলামিক শাসনব্যবস্থা স্থাপনের সূক্ষ্ম আর সুনিয়োজিত ষড়যন্ত্র। শুধু উত্তরপ্রদেশেই নয়, সারা ভারতেই চলছে এই প্রক্রিয়া। ভারতে ইসলামিক ব্যাংক,স্কুল--- কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, হসপিটাল, শরিয়া আদালত সবই আছে। পূর্ববর্তী সোনিয়া সরকারের অর্থমন্ত্রী চিদাম্বরম ও প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহের অনুমোদনেই স্থাপিত হয়েছে ইসলামিক ব্যাংকিং সংস্থা, যেমন তামিম ইম্পেক্স, বাইতুন নাসের আরবান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড ইত্যাদি।

তাই আজ ভারতে যোগী আদিত্যনাথ ও হেমন্ত বিশ্বশর্মার মতো অদম্য সাহসী ও নির্ভীক রাজনেতার বড়োই প্রয়োজন। উত্তরপ্রদেশের মতো অন্য রাজ্যেও এরকম আইন বলবৎ করা উচিত। হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতি বাঁচানোর একমাত্র উপায় দেশে ভারতীয় দণ্ড-সংহিতা, জন্মনিয়ন্ত্রণ ও ভারতীয় নাগরিক সংহিতা বা অভিন্ন দেওয়ানি বিধি অবিলম্বে লাগু করা। এজন্য চাই রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, ইচ্ছাশক্তি ও অদম্য সাহস। উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে ধন্যবাদ যে, তিনি এই লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে চাইছেন। ▯

অগ্নিযুগের বঙ্গের বিপ্লবীরা ইংরেজ শাসনের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছিলেন

অমিত চৌধুরী

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সমগ্র বঙ্গে উদ্দাম ঝড় উঠতে শুরু করলো। তরুণদের মধ্যে ভীষণ চাঞ্চল্য দেখা দিল। যুগান্তর দল ও অনুশীলন সমিতির বৈপ্লবিক কার্যকলাপে বঙ্গের তরুণ যুবকেরা আকৃষ্ট হচ্ছিল। ইংরেজদের অত্যাচারও প্রতিদিন উত্তরোত্তর সীমাহীন পর্যায়ে যাচ্ছিল। বন্দেমাতরম পত্রিকায় প্রকাশিত একটি লেখা শ্রীঅরবিন্দের কিনা তা প্রমাণের ক্ষেত্রে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য বিপিনচন্দ্র পালকে ডাকা হলে তিনি সাক্ষ্য দিতে রাজি না হওয়ায় আদালত অবমাননার দায়ে তার ছয় মাসের কারাদণ্ড হলো। সেদিন আদালতের বাইরে প্রচুর ভিড় সামলাতে গিয়ে এক ইংরেজ সার্জেন্ট ১৫ বছরের সুশীল সেনকে বেয়নেট দিয়ে আঘাত করলে সুশীল সেনও পালটা ঘুষি চালিয়ে দেয়। এতে ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে কিংসফোর্ড সাহেব সুশীল সেনকে ১৫ ঘা বেত্রাঘাতের নির্দেশ দেন। বিপ্লবীরা ক্ষেপে উঠে প্রতিজ্ঞা করলেন যে এই অত্যাচারী নিষ্ঠুর কিংসফোর্ডকে হত্যা করতে হবে। এদিকে বঙ্গের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি দেখে নিরাপত্তার কারণে ইংরেজ সরকার কলকাতা থেকে তাকে বিহারের মুজাফ্‌ফরপুরে বদলি করে দেয়। বিপ্লবীরা প্রতিজ্ঞা করলেন, মুজাফ্‌ফরপুর কেন পৃথিবীর যেখানেই যাক না, ১৫ ঘা বেতের প্রতিশোধ ১৫ বুলেটে নেওয়া হবে। ১৯০৮ সাল, এপ্রিল মাস। ঘটনার পাঁচদিন আগে মুজাফ্‌ফরপুরের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করলেন দুই বিপ্লবী— ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী। তাদের ছদ্মনাম ছিল যথাক্রমে হরেন সরকার ও দীনেশ রায়। অমাবস্যার রাত। সামনেই ইউরোপিয়ান ক্লাব। বাইরে একটি গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে ওরা দু'জন। কখন বেরোবে ওই কুখ্যাত অত্যাচারী কিংসফোর্ড।

ক্ষুদিরাম

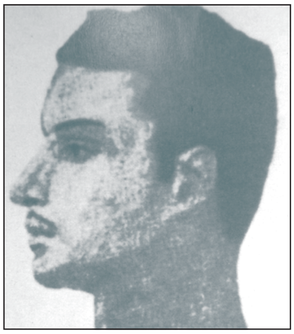
প্রফুল্ল চাকি

ওরা প্রস্তুত। গেট দিয়ে বেরিয়ে আসছে কিংসফোর্ডের ফিটন গাড়ি। আর দেরি নয়। রক্তে আগুন ধরে গেল। ছুঁড়লেন বোমা। রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে গেল বোমার শব্দে। তাঁরা দ্রুত পালিয়ে গেলেন। গাড়িতে কিংসফোর্ড ছিল না। মৃত্যু হলো ব্যারিস্টার প্রিংলে কেনেডির স্ত্রী ও কন্যার। উদ্দেশ্য সফল হলো না। প্রফুল্ল চাকী ধরা পড়লে নিজের গুলিতেই আত্মহত্যা করলেন। ক্ষুদিরামও ধরা পড়লেন। বিচারে তার ফাঁসি হয়। ক্ষুদিরামের দাহকার্যে ভাগ নেওয়া এক ব্যক্তি অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন তারপর চিতায় শোয়ানো হলে রাশিকৃত ফুল দিয়ে মৃতদেহ সম্পূর্ণ ঢেকে দেওয়া হলো। কেবল ওর হাস্যোজ্জ্বল মুখখানি অনাবৃত ছিল। দেহটি ভস্মীভূত হতে বেশি সময় লাগলো না। চিতার আগুন নেভাতে গিয়ে প্রথম কলসি জল ঢেলে দিলে তপ্ত ভস্মরাশি খানিকটা আমার বুকে উড়ে এসে পড়লো। তার জন্য জ্বালা যন্ত্রণা বোধ করবার মতো মনের অবস্থা তখন ছিল না।'

বাঘা যতীন

শ্রীঅরবিন্দ

প্রফুল্ল চাকী সমস্তিপুরে পালিয়ে যান, সেখানে তার মৃতদেহ মুজাফ্‌ফরপুরে আনলে ক্ষুদিরাম শনাক্ত করেন। কিন্তু শনাক্তকরণের পর যা করা হলো মধ্যযুগীয় বর্বরতাকে

বিনয়

বাদল

দীনেশ

হার মানায়। প্রথমেই দেহ থেকে প্রফুল্লর মাথাটাকে কেটে বিচ্ছিন্ন করা হলো, তার পর সেই কাটা মাথাটাকে পুলিশকর্তার নির্দেশে কেরোসিন টিনে স্পিরিটে ডুবিয়ে কলকাতায় আনা হলো। ভালো করে শনাক্ত করার উদ্দেশ্যেই নাকি এইরূপ করা হয়েছিল। প্রতিবাদের ঝড় উঠলো, সুসভ্য ইংরেজ জাতির সভ্যতার নিদর্শন বটে!

বঙ্গের অগ্নিযুগের এই দুই মহান নির্ভীক বিপ্লবীর আত্মত্যাগের মধ্য দিয়েই শুরু হয়েছিল বঙ্গপ্রদেশে বিপ্লবের সূচনা।

বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স ছিল ভারতের ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে একটি গুপ্ত বিপ্লবী দল। এই দলটি ১৯২৮ সালে শুরু থেকে ভারতের স্বাধীনতা পর্যন্ত কার্যকর ছিল। এই বিপ্লবী দলটি ১৯৩০-এর দশকের গোড়ার দিকে অপারেশন ফ্রিডম শুরু করে। প্রাথমিকভাবে তাঁরা বঙ্গপ্রদেশের বিভিন্ন জেলে পুলিশের দমন পীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। ১৯৩০ সালের আগস্টে বিপ্লবী দলটি পুলিশের মহাপরিদর্শক লোম্যানকে হত্যার পরিকল্পনা করে। অসুস্থ ও চিকিৎসাধীন একজন সিনিয়র পুলিশ অফিসারকে দেখতে ঢাকার মেডিক্যাল স্কুল হাসপাতালে লোম্যান গিয়েছিলেন। ২৯ আগস্ট, বিনয় বসু যিনি মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্র ছিলেন, ঐতিহ্যবাহী বাঙ্গালি পোশাক পরে নিরাপত্তা লঙ্ঘন করেন এবং খুব কাছ থেকে গুলি চালান। লোম্যান তৎক্ষণাৎ মারা যায় এবং পুলিশ সুপার হাডসন গুরুতর আহত হয়। পরে বিনয় ঢাকা থেকে কলকাতায় চলে আসেন। তাদের পরবর্তী লক্ষ্য ছিল মহাপরিদর্শক কর্নেল সিম্পসন, যিনি কারাগারে বন্দিদের উপর নির্মম নিপীড়নের জন্য কুখ্যাত ছিলেন। বিপ্লবীরা শুধু তাকে হত্যাই নয়, কলকাতার ডালহৌসি স্কোয়ারের রাইটার্স বিল্ডিংসে আক্রমণ চালানোর সিদ্ধান্ত নেয়।

১৯৩০ সালের ৮ ডিসেম্বর বিনয় বসু, দীনেশ গুপ্ত ও বাদল গুপ্তর ইউরোপীয় পোশাকে রাইটার্স বিল্ডিঙে প্রবেশ করেন এবং সিম্পসনকে গুলি করে হত্যা করেন। ব্রিটিশ পুলিশ গুলি চালাতে থাকে, ফলে তিন তরুণ বিপ্লবী এবং পুলিশের মধ্যে গুলির লড়াই হয়। কয়েকজন অফিসার আহত হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিশ তাদের নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে তাঁরা গ্রেপ্তার হতে চাননি। বাদল পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়ে আত্মহত্যা করেন, আর বিনয় ও দীনেশ রিভলবার দিয়ে নিজেদের গুলি করেন। ঘটনাস্থলেই বাদলের মৃত্যু হয়। বিনয়কে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে ১৩ ডিসেম্বর তিনি আঙুল দিয়ে তার ক্ষত সংক্রমিত করার পরে বীরের মতো মৃত্যুবরণ করেন। দীনেশ মারাত্মক আঘাত পেয়েও বেঁচে যান। বিচারে তাঁকে ফাঁসি দেয় ইংরেজ সরকার। ডালহৌসি স্কোয়ার চত্বর বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ নামে পরিগণিত হয়েছে। ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে এই মহান তিন বীর বিপ্লবীর আত্মত্যাগের ইতিহাস।

যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বাঘা যতীন নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি সামান্য একটি কুকরি হাতে নিয়ে এক হিংস্র বাঘের সঙ্গে লড়াই করে বাঘটিকে হত্যা করে বহু মানুষের প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন। তারপর থেকে এই অসম-সাহসী মানুষটিকে বাঘাযতীন বলে দেশবাসী জানে। যিনি বাঘ হত্যা করে মানুষের প্রাণ রক্ষা করেছেন তিনি মানুষরূপী অত্যাচারী রক্তখেকো ব্রিটিশের সঙ্গে লড়াই করে ভারতবাসীকে বাঁচানোর জন্য তাঁর মন যে আনচান করবে স্বাভাবিক। তিনি অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তর দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিপ্লবী আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন।

১৯০৮ সালে এপ্রিল মাসে বাঘাযতীন শিলিগুড়ি স্টেশনে তিনজন ইংরেজ গোরা সৈন্যের সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পড়েন এবং ভীষণ ভাবে তাদের মারধর করেন। তাঁর সাহসিকতা ইংরেজদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তার বিরুদ্ধে মামলা হয়। একজন নেটিভের হাতে তিনজন ইংরেজের মার খাওয়া! তাই মামলা খারিজ করে দেওয়া হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ভারতীয়দের বিপ্লবী আন্দোলনকে জার্মানরা সমর্থন করায় বাঘাযতীন জার্মানি থেকে অস্ত্রশস্ত্র আনার চেষ্টায় ওড়িশার বালেশ্বরে গিয়েছিলেন। তার খোঁজে আসা চার্লস টেগারেটের বাহিনীর সঙ্গে এক অসম লড়াইয়ে বীরের মতো মৃত্যুবরণ করে দেশমাতৃকার কোলে ঢলে পড়েন এই মহান বিপ্লবী।

ঋষি অরবিন্দ ঘোষ ছিলেন একেধারে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, বিপ্লবী, কবি, যোগী ও দার্শনিক। স্বাধীনতা ও জীবনের বিবর্তনের জন্য তিনি সাধনা করে গেছেন। ১৮৭২ সালে ১৫ আগস্ট কলকাতায় জন্মেছিলেন। দার্জিলিঙে প্রাথমিক শিক্ষার পর ইংল্যান্ডে পাঠানো হয়। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েও ইচ্ছাকৃতভাবে অশ্ব চালনায় ব্যর্থ হয়ে ভারত সরকারের চাকরির অনুমতি পাননি। দেশে ফিরে বরোদায় কলেজের অধ্যক্ষ হন মাসিক ৭৫০ টাকা বেতনে। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে তিনি সেই চাকরি ছেড়ে দিয়ে মাসিক ১৫০ টাকা বেতনে বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজে যোগ দেন। তিনি ভারতে রাজনৈতিক জাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ ছিলেন। ইংরেজি দৈনিক বন্দেমাতরম পত্রিকায় ব্রিটিশ বিরোধী লেখা লিখতেন। আলিপুর বোমা মামলা শ্রীঅরবিন্দের জীবনে একটি টার্নিং পয়েন্ট। এক বছর তিনি কারাগারের নির্জন কক্ষে থেকে আধ্যাত্মিক জীবনের দিকে ঝুঁকে পড়েন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের চেষ্টায় তিনি সেই মামলা থেকে মুক্তি পান এবং পরবর্তীতে তিনি পণ্ডিচেরি আশ্রমে চলে আসেন এবং সম্পূর্ণরূপে এক নতুন আধ্যাত্মিক জীবনে নিজেকে সঁপে দেন। তিনি বলতেন, ভারতের জাতীয়তা হিন্দু জাতীয়তা। সনাতন ধর্মের উত্থানই ভারতের উত্থান, তার পতনই ভারতের পতন। তিনি আরও বলতেন— লোকে দেশকে ইট, পাথর, নদ-নদী, পাহাড় পর্বত বলে জানে, আমি দেশকে মা বলে জানি, ভক্তি করি পূজা করি।

তিনি এও বলেছেন— বিশ্বের জন্যই ভারতকে বেঁচে থাকতে হবে। ১৫ আগস্ট তাঁর জন্মদিনেই ভারত স্বাধীন হয়েছে। দেশ বিভাজন হলে তিনি বলেন— 'এই বিভাজন কৃত্রিম যা এড়ানো সম্ভব না হলে ভারত ভীষণ ভাবে দুর্বল হয়ে পড়বে।' আজ দেশের দিকে তাকালে মনে হয় ঋষিবাক্য সত্য হতে চলেছে।

কুখ্যাত ইংরেজ পুলিশ অফিসার চার্লস টেগার্ট বলেছিলেন যে বাঙ্গালি বিপ্লবীরা নিঃস্বার্থ রাজনৈতিক কর্মী। বাঘাযতীন ছিলেন এক উজ্জ্বল উদাহরণ। স্বামী বিবেকানন্দই ভবিষ্যতে বিপ্লবী হিসেবে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সম্ভাবনা উপলব্ধি করেছিলেন এবং কুস্তি শেখার পরামর্শ দিয়েছিলেন। শ্রীঅরবিন্দের ভাই বারীন ঘোষের সঙ্গে মানিকতলা ও দেওঘরে বোমা কারখানা স্থাপন করেছিলেন বৈপ্লবিক কার্যকলাপের জন্য। তিনি সামরিক অভিযানে ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত মানুষের সেবা করতেন। তিনি ধর্মীয় অনুষ্ঠানেও অংশ নিতেন। তাই বঙ্গের বিপ্লবীরা সারা ভারতবর্ষে নমস্য ছিলেন। □

বাঙ্গালি বিপ্লবীর স্মৃতি-তর্পণ

শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাঙ্গলার বিপ্লবী আন্দোলন ছিল তারুণ্যে ভরপুর। সে সময় ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী ছিল কলকাতা। সারা ভারতবর্ষ পরিচালিত হতো আমাদের এই অখণ্ড বঙ্গপ্রদেশ থেকে। আর স্বাভাবিক ভাবে ইংরেজ তাড়ানোর সমস্ত প্রয়াসও শুরু হয়েছিল এখানেই। বিংশ শতকের প্রথম দুই দশকে বাঙ্গলার তরুণের দল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল। অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর দল, বেঙ্গল ভলিন্টিয়ার-সহ অনেক ছোটো বড়ো মুক্তিযোদ্ধার দল বাঙ্গলার নবীন প্রজন্মের বুকে দেশভক্তির এমন মশাল জ্বালিয়েছিল যার লেলিহান শিখায় দেড়শো বছর ধরে তিল তিল করে গড়ে তোলা ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যেন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। ব্রিটিশ সেদিন বুঝেছিল এদেশে তাদের শেষের সে দিন সমাগত।

তারই ফলশ্রুতিতে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ। তৎকালীন ভাইসরয় কার্জনের এক কলমের খোঁচায় হাজার বছরের শাসনে বিদেশি মুসলমান শাসক যা করার সাহস পায়নি তা করতে গেল কার্জন সাহেব। হিন্দু-মুসলমান সংখ্যাতত্ত্বের চাতুরীতে অখণ্ড বঙ্গ ভেঙে বিপ্লবকে স্তিমিত করার প্রয়াস হলো। এ যেন জলের অভাবে তেল দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা। এবার আর কেবল তরুণ যুবারা নয়, বাঙ্গলার সুশীল সমাজ, বিদ্বগ্ধ জনেরাও প্রতিবাদে মুখর হলেন। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী নেতৃত্বে এগিয়ে এলেন রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। প্রমাদ গুনল শাসক। এঃ, বড়ো ভুল হয়ে গেল! কিন্তু উপায়? থুতু ফেলে থুতু চাটা? সে যে বড়ো লজ্জার। সে তো সম্ভব নয়। তার চেয়ে লাঠি-গুলি-বেয়নেটের জোরে সামাল দিতে হবে এই প্রতিবাদকে। ব্যাস, শুরু হলো অকথ্য দমন-পীড়ন। 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিতে মাতোয়ারা হাজার হাজার জনতার ভিড়কে লাঠির ঘায়ে কি দমিয়ে রাখা যায়?

১৯০৬ সাল, বরিশালে কংগ্রেসের অধিবেশন। বন্দেমাতরম ধ্বনিতে মুখরিত সভা লাঠি চার্জ করে ভেঙে দিল পুলিশ। চারিদিকে রক্তাক্ত মানুষের হুড়োহুড়ি। তার মধ্যে দাঁড়িয়ে ১৪ বছরের বালক চিত্তরঞ্জন। সে তার ছোট্ট হাতের মুঠি আকাশে তুলে ধ্বনি দিচ্ছে--- 'বন্দেমাতরম'। মুহূর্তে পুলিশের লাঠিতে লুটিয়ে পড়ল চিত্ত। তবু বন্দেমাতরম বন্ধ হলো না। পরে হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে চিত্ত তার বাবাকে বলেছিল— বাবা, পুলিশ যতবার আমাকে লাঠি মেরেছে, আমি ততবার 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি দিয়েছি, আমাকে ওরা চুপ করাতে পারেনি।

শত প্রতিবাদেও বঙ্গভঙ্গে অনড় ইংরেজ। বাঙ্গলার যুবসমাজও বুঝল নিরামিষ শান্তির বাণী, অনুরোধ উপরোধের দয়াদাক্ষিণ্য, একগালে চড় খেয়ে অন্য গাল বাড়িয়ে দেওয়া— এভাবে আত্মসম্মান বন্ধক রেখে স্বাধীনতা আসবে না। স্বাধীনতা আসবে শৌর্য বীর্যের প্রতাপে, গায়ের জোরে। জন্ম হলো চরমপন্থী আন্দোলনের। বাঙ্গলার যুবকের হাতে বোমা পিস্তল, রিভলবারের আনাগোনা শুরু হলো।

প্রমাদ গুনল ইংরেজ। তারা দেখেছিল বঙ্গভঙ্গ বিরোধী এই আন্দোলনে কিছু শিক্ষিত জাতীয়তাবাদী মুসলমান ছাড়া বাকি মুসলমান সমাজ নিশ্চুপ। তারই সুযোগ নিয়ে ১৯০৬ সালে বড়লাট মিন্টোর পরামর্শে ঢাকার নবাব খাজা সেলিমুল্লাহের নেতৃত্বে এই ঢাকার মাটিতেই রোপিত হলো দ্বিজাতিতত্ত্বের বিষাক্ত বীজ— মুসলিম লিগ। মুসলমান সমাজ সেদিন থেকেই আরও বিষাক্ত হয়ে উঠলো। তাই বাঙ্গলার স্বাধীনতা সংগ্রামে ফাঁসিকাঠেই হোক বা ব্রিটিশের গুলিতেই হোক— একজন মুসলমান তরুণ যুবার নাম খুঁজে পাওয়া যায়নি। *(তথ্যসূত্র : 'মৃত্যুঞ্জয়ী'— তথ্য সংস্কৃতি বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার)*

কিন্তু তা বলে কি বাঙ্গলার তরুণ সমাজ চুপ করে বসে থাকবে? এদেশ যে তার জন্মভূমি, মা। তাকে পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত করা তো তাদেরই দায়িত্ব। তাই প্রাণ বাজি রেখে শুরু হলো সশস্ত্র সংগ্রাম। ১৯০৮ সালে ১৮ বছরের ক্ষুদিরাম আর ১৯ বছরের প্রফুল্ল চাকী কিংসফোর্ডের গাড়িতে ছুড়লেন বোমা। সে আক্রমণ লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেও টলে গেল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত। প্রফুল্ল আত্মহত্যা করল, আর ক্ষুদিরাম হাসতে হাসতে ফাঁসির দড়ি গলায় টেনে নিল। এ যেন 'মরণরে, তুহুঁ মম শ্যাম সমান।' সেই শুরু। তারপর শুধু তারুণ্যের স্রোত। শ্রীঅরবিন্দ, বারীন ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, হেম দাস, সত্যেন বসু, কানাইলাল, ভূপেন্দ্র, বিভূতি, বীরেন্দ্র, সুধীর, শৈলেন্দ্র, প্রদ্যোৎ— আরও কত। এ যেন অপার সমুদ্রের ঢেউ। একটি ওঠে, মিলিয়ে যায়, তো আর একটি ধেয়ে আসে।

অশান্ত মেদিনীপুর। একজন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটও এখানে প্রাণ বাঁচাতে পারেনি। পেডি, ডগলাস, বার্জ— সবাই নিয়োগের কয়েক মাসের মধ্যে বেঘোরে মারা পড়ছে। চট্টগ্রাম-সহ পূর্ববঙ্গ তো ইংরেজের মুণ্ডু নিয়ে গেন্ডুয়া খেলছে। এভাবে ভয়ে ভয়ে বাঁচা যায়? চোরের মতো লুকিয়ে দেশ শাসন করা যায়? তার চেয়ে অন্য জায়গায় 'বসত' করা ভালো। চাই না বাবা বঙ্গবিভাগ! বেঙ্গল পার্টিশান অ্যাক্ট চুলোয় যাক। আগে 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা।' অবশেষে ২০১১ সালে বেঙ্গল পার্টিশানের সেটেল ফ্যাক্ট-কে আনসেটেল ঘোষণা করে বাঙ্গলা থেকে পাকাপাকি পাততাড়ি গোটাল ভীরু ইংরেজ। 'রইল ঝোলা চলল ভোলা।'

> **বীর বাঙ্গালির ইতিহাস লুকিয়ে বাঙ্গালিকে মেরুদণ্ডহীন, ক্লীব, আত্মগৌরবহীন বানাতে চায়। এরা ভুলিয়ে দিতে চায় মুজাফ্ফরপুর, ইউরোপীয়ান ক্লাব, চাঁদনীচকের বোমার শব্দ, জালালাবাদ রণাঙ্গনের বীরত্ব, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের গৌরব, আর রাইটার্স বিল্ডিঙের অলিন্দ যুদ্ধের অমর ইতিহাসকে।**

ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে স্থানান্তরিত হলো দিল্লিতে।

২৩ ডিসেম্বর ১৯১২। দিল্লিতে সেদিন সাজো সাজো রব। ইংরেজ শাসক পঞ্চম জর্জের রাজ্যাভিষেক সঙ্গে ভারতের বড়লাট হার্ডিঞ্জের দায়িত্ব গ্রহণের অনুষ্ঠান। চাঁদনি চকে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শোভাযাত্রা। চারিদিকে আলো আর পতাকার সমারোহ। লোকে লোকারণ্য। হাতির পিঠে চেপে সস্ত্রীক হার্ডিঞ্জ চলেছেন রাজকর্মচারী ও দেশীয় মোসাহেব পরিবৃত হয়ে। আশে পাশের ছাদে তখন মেয়েদের ভিড়। সবাই একবার বড়লাটকে দেখতে চায়। হঠাৎ কোথা থেকে এক সুবেশী তরুণী উপস্থিত। কী তার রূপ। স্বাস্থ্যে, সৌন্দর্য, যৌবনে ভরা এক উজ্জ্বল শিখা। 'তোমার নাম কী বহেন?' যুবতী মিষ্টি হেসে উত্তর দিল— 'লীলাবতী'। ইতিমধ্যে শোভাযাত্রা এসে গেল। দোতালার ঠিক নীচেই হাতির পিঠে চড়ে সস্ত্রীক বড়োলাট। হঠাৎ— বু-ম্-ম্!!! প্রচণ্ড বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল রাজপথ, চারিদিকে শুধু ধোঁয়া আর ধোঁয়া। চারিদিকে আর্তচিৎকার--- পালাও। চরম বিশৃঙ্খলা। মোসাহেবদের দৌড়টা ছিল দেখার মতো। বোমার শব্দে হাতিগুলির উন্মত্ত ছোটোছুটি। ধোঁয়া সরতে দেখা গেল বড়োলার্টের মাহুতটি মারা পড়েছে। আর বড়লাটের অবস্থাও সঙ্গীন। কোনো মতে শেষ হলো শোভাযাত্রা। বোঝা গেল কলকাতার মতো দিল্লিও রাজাবাহাদুরের কাছে সুরক্ষিত নয়।

আশ্চর্য, এই হট্টগোলের মাঝে সেই সুন্দরী তরুণী লীলাবতী যেন হাওয়ায় উবে গেছে। সে গেল কোথায়? আর বোমাটিই-বা কে ছুঁড়ল? বোঝা গেল অনেক পরে। কোনো তরুণী নয়, লীলাবতীর রূপ ধরে বোমাটি ছুঁড়েছিল নদীয়ার ছেলে বসন্ত বিশ্বাস। খোঁজ খোঁজ খোঁজ। এর পেছনে মূল মন্ত্রণাদাতা কে? প্রতিবাদে সরব দেশীয় রাজা মহারাজার দল। তাদের চেয়েও প্রতিবাদে সবাইকে ছাপিয়ে গেল দেরাদুন বনবিভাগের বিশিষ্ট সরকারি কর্মচারী বাঙ্গালি রাসবিহারী বসু। এক প্রতিবাদ সভায় বড়লাটের দুঃখে কেঁদে ফেললেন তিনি। শাসক তো! তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সত্যি, তার মতো রাজভক্ত প্রজা আর ক'জন হয়।

১৯১৩ সালের ১৭ মে। লাহোরের পুলিশ ক্লাবে আবার বোমা পড়ল। দিশেহারা পুলিশ খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে যোগসূত্র পেল কলকাতার। ধরা পড়ল দীননাথ তলোয়ার। নির্মম অত্যাচারে হার মানল সে। ফাঁস হয়ে গেল বড়লার্টের ওপর হামলার চক্রান্ত। দিল্লির হামলাই হোক বা লাহোরের বোমা বিস্ফোরণ— এ সবের পেছনে একজনই। সে আর কেউ নয়— দেরাদুন বনবিভাগের সেই বিশিষ্ট রাজকর্মচারী রাসবিহারী বসু। রাসবিহারী! লালমুখো ইংরেজ থেকে শুরু করে চেনাপরিচিত সকলে স্তম্ভিত। তা কী করে হয়? সে তো সরকারের পেয়ারের লোক?

তবে কি বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা? এত বড়ো দুঃসাহস? ধরে আন বিশ্বাসঘাতকটাকে। কিন্তু কোথায় রাসবিহারী। ততক্ষণে তল্পিতল্পা গুটিয়ে তিনি হাওয়া। তার মাথার দাম ১ লক্ষ বারো হাজার টাকা ঘোষণা করা হলো। তবুও তিনি রইলেন অধরা। কতবার তিনি পুলিশের মুখোমুখি হয়েছেন, তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছেন, কিন্তু তাকে তারা চিনতেই পারেনি। কখনো উড়ে ঠাকুরের ছদ্মবেশে, কখনও ময়লার বালতি মাথায় ঝাড়ুদারের বেশে, আবার কখনো শিয়ালদহ স্টেশনের পোস্ট অফিসের দোতালায় বেহালা বাজানো ফিরিঙ্গির রূপ ধরে। তারপর সোজা পাড়ি দিলেন জাপানে। লক্ষ্য বিদেশের মাটিতে গিয়ে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সেনাদল গঠন। পরবর্তীকালে যার ভার নেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। এ সবই এই বাঙ্গলা মায়ের দামাল ছেলেরাই করেছে।

১০ সেপ্টেম্বর ১৯১৫। বুড়িবালামের যুদ্ধের বীরত্ব তো অমর হয়ে আছে স্বাধীনতার ইতিহাসে। যে ছেলে ছোটোবেলায় মাত্র একটা ছোরা নিয়েই বাঘ মেরেছিলেন তার নাম তো বাঘাযতীন না হয়ে যায় না। বাঙ্গলার বিপ্লবীদের হাতে অস্ত্র তুলে দিতে কী অদম্য চেষ্টা। ওড়িশার শ্বাপদসংকুল জঙ্গলে মহলডিহাতে রাতের পর রাত কাটিয়ে, দুর্গম পাহাড়ের অন্ধকার গুহায় বিষাক্ত সাপ ও জন্তুর সঙ্গে একসঙ্গে বাস করে, সারারাত পায়ে হেঁটে ৯ সেপ্টেম্বর ভোরবেলা পৌঁছেছিলেন বুড়িবালামের তীরে। সাঁতার কেটে নদীর ওপারে পৌঁছে এক শুকনো ডোবায় আশ্রয় নিয়েছিলেন তিনি। তারপর সেই একই পরিণতি। ব্রিটিশ সেনার সঙ্গে অসম যুদ্ধ, অবশেষে পরের দিন হাসপাতালে প্রাণত্যাগ। মরার আগে তাঁর বিস্ময়— 'এত রক্ত ছিল শরীরে! আমি ভাগ্যবান। প্রতিটি রক্তবিন্দু অর্পণ করার সুযোগ পেলাম দেশমাতার চরণে।'

এমনি করে ব্রিটিশের লাঠি-গুলি কত তরুণ বালক-নারী-শিশুর রক্তে রাঙিয়ে দিয়েছিল বাঙ্গলার মাটি তার হিসেব নেই। হিসেব নেই এই বাঙ্গলার কত নাম না জানা বিপ্লবী যাদের স্থান হয়নি বর্তমানের কবি লেখক বা ইতিহাস রচয়িতাদের বইয়ের পাতায়। তবু তাঁদেরই আত্মদানে এসেছে আমাদের স্বাধীনতা। অগ্নিযুগের সেই বীর বীরাঙ্গনাদের কাহিনি আজও আমাদের অনুপ্রেরণা দেয়, পথ চলার দিশা দেখায়। কিন্তু যাদের বলিদানে এই দেশ, এই বঙ্গভূমি মুক্ত বাতাসের আস্বাদ পেল সেই যোদ্ধাদের স্থান আজ কোথায়?

অধুনা বাংলাদেশের কথা বাদ দিন। লোভী নেতাদের কোপে সে না হয় আজ পরদেশ হয়ে গেছে। তারা না হয় ভারত ভেঙে বাঙ্গলা ভাগ করে খণ্ডিত বাঙ্গলাকে ইসলামের রঙে সাজাতে মাস্টারদা, প্রীতিলতাদের ভুলে গেছে। কিন্তু আমরা, হিন্দুর আবাসস্থল পশ্চিমবঙ্গে? আমরা কি এই দেশের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করা ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল, বিনয়-বাদল-দীনেশ, লোকনাথ, টেগরা (হরিগোপাল বল), মনোরঞ্জন, বাঘাযতীন, যতীন দাসকে মনে রেখেছি? পঞ্চম শ্রেণী থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত ইতিহাস বই ঘেঁটে ফেলুন। তন্ন তন্ন করে খুঁজলেও পাবেন না। কংগ্রেসি সরকার বাঙ্গালির আগামী প্রজন্মকে আমাদের বীর ও বীরাঙ্গনাদের সেই বীরত্বের কাহিনি পাঠ্যপুস্তকে ঠাঁই দেয়নি। এ এক গভীর চক্রান্ত।

এরা বীর বাঙ্গালির ইতিহাস লুকিয়ে বাঙ্গালিকে মেরুদণ্ডহীন, ক্লীব, আত্মগৌরবহীন বানাতে চায়। এরা ভুলিয়ে দিতে চায় মুজফ্‌ফরপুর, ইউরোপীয়ান ক্লাব, চাঁদনীচকের বোমার শব্দ, জালালাবাদ রণাঙ্গনের বীরত্ব, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের গৌরব, আর রাইটার্স বিল্ডিংের অলিন্দ যুদ্ধের অমর ইতিহাসকে। এরা নিভিয়ে দিতে চায় বাঙ্গালির বীরত্বের স্মৃতিসৌধে জ্বলতে থাকা দেশভক্তির মশালকে। সে কাজে তারা অনেকাংশে সফলও। কমিউনিস্ট শাসকের চৌত্রিশ বছরের শাসনে বাঙ্গালি যুব সম্প্রদায়ের কাছে ক্ষুদিরামের আত্মত্যাগ আজ হয়ে গেছে 'বার খেয়ে ক্ষুদিরাম'-এর খিল্লিতে। অথবা নিঃস্বার্থভাবে দেশ-সমাজের কাজ করাটা পর্যবসিত হয়েছে 'ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর' বাগ্‌ধারায়।

কবি ভবেন্দু ভট্টাচার্যের একটি সুন্দর কবিতা আছে। সেই কবিতায় আবেগঘন প্রশ্ন— 'যারা চেয়েছিল ভেঙে ফেলে দিতে পরাধীনতার কারা, এই ভারতের স্বাধীনতা দিনে কোথায় রহিল তারা?' সত্যিই তো, স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরেও আমরা কি তাদের মনে রেখেছি? কিন্তু আমাদের থেমে থাকলে চলবে না। স্বার্থান্বেষী শাসকের কাজ ভুলিয়ে দেওয়া, আমাদের কাজ জাগিয়ে রাখা। কংগ্রেস-কমিউনিস্ট শাসকের কাজ বাঙ্গালির অর্জিত অতীত গৌরব লুকিয়ে রাখা, আমাদের কাজ নবীন প্রজন্মের কাছে সেই কীর্তি পুনঃস্মরণ করানো। আসুন, আমরা সকলে মিলে সেই কাজে হাত লাগাই। তবেই হবে বীর বাঙ্গালি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি সত্যিকারের স্মৃতি তর্পণ। □

শক্তিশালী ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন বিপ্লবী পুলিনবিহারী

বিশ্বরঞ্জন দাস

স্বাধীনতা লাভের পঁচাত্তর বছরের অমৃতলগ্নে এসেও আমাদের অনেকের স্মৃতিতে কিংবা ইতিহাসের পাতায় ভারতবর্ষের সশস্ত্র আন্দোলন এক বিচ্ছিন্ন ঘটনা মাত্র। তাই পাঠ্যপুস্তকের বাইরে খুঁজতে হয় সেইসব দেশব্রতীদের যাঁরা ভারতকে মা মনে করে তার সম্মানরক্ষায় উঠে দাঁড়ান। তারই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ঢাকা অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা অধিনায়ক পুলিনবিহারী দাস। আজকের দিনে আপামর যুবসমাজ উজ্জীবিত হবে তাঁর কর্মকাণ্ডকে স্মরণ করে।

১৯০৫ সালের ১৬ আগস্ট বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হলো। শুরু হলো বঙ্গভঙ্গ প্রতিবাদ আন্দোলন যা অচিরেই পরিণত হলো ব্রিটিশ তাড়াও আন্দোলনে। এই সময়েই স্বাধীনতার চেতনায় বহু বিপ্লবীর মাঝে উদীয়মান হলেন এক প্রত্যয়ী যুবক পুলিনবিহারী দাস। পরাধীন ভারতকে স্বাধীন করতে আত্মনির্ভরতার পথ দেখিয়েছিলেন তিনি। কোনও পরাক্রমী শক্তির সঙ্গে লড়তে গেলে নিজেকেও সেভাবে তৈরি করা চাই। সে জন্য দরকার শারীরিক ও মানসিক শক্তিও। আজ থেকে ১১৭ বছর আগে ঢাকা অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠা করে সেই পথই দেখিয়েছিলেন বিপ্লবী পুলিনবিহারী।

বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে যখন উত্তাল বঙ্গপ্রদেশ, তখনই সনাতন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অবিসংবাদী দুই নেতা বিপিনচন্দ্র পাল ও প্রমথনাথ মিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় পুলিনবিহারীর। ভারতমাতার শৃঙ্খল মুক্তির জন্য ঢাকা অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠার ভার বর্তায় তাঁর ওপর। ৮০ জন যুবককে নিয়ে পুলিনবিহারী শুরু করেন ঢাকা সমিতির কাজ। সাংগঠনিক দক্ষতার গুণে অনুশীলন সমিতির পাঁচশোরও বেশি শাখা খোলেন। তাঁর আখড়ায় কম-বেশি পঞ্চাশ হাজার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবক ছিল। সে সময়ে (১৯০৬) সারা ভারতে তো বটেই এমনকী এশিয়া মহাদেশেও এ ছিল এক বিরল দৃষ্টান্ত।

এরপর ঢাকাতেই প্রতিষ্ঠা হয় সশস্ত্র বিপ্লবের প্রশিক্ষণের জন্য 'ন্যাশনাল স্কুল'। মাত্র দু-বছরের মধ্যেই পুলিনবিহারী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ত্রাস হয়ে ওঠেন। এমন বিপ্লবীকে ছেড়ে রাখা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষে বিপজ্জনক তো বটেই। বিপ্লবী দল পরিচালনার অভিযোগে ছলে-বলে-কৌশলে পুলিনবিহারীকে গ্রেপ্তার করে ব্রিটিশ পুলিশ। তাঁকে মন্টোগোমারি জেলে পাঠানো হয়। ১৯১০ সালে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে ফের শুরু করেন সশস্ত্র বিপ্লবের কাজ। ওই বছরের জুলাই মাসে ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়ে আন্দামানের সেলুলার জেলে পাঠানো হয়।

১৯১৯ সালে জেল থেকে মুক্তি পান পুলিনবিহারী। ইতিমধ্যে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে অনুশীলন সমিতিকে। ফলে সমিতির সদস্যরা সকলেই বিচ্ছিন্ন। পুলিশি উৎপীড়নে ছন্নছাড়া বিপ্লবীরা, গান্ধীজীর নেতৃত্বে চলছে অসহযোগ আন্দোলন। কিন্তু গান্ধীজীর অহিংস মতবাদের সঙ্গে একমত হতে পারেননি পুলিনবিহারী। সে যুগে গান্ধীজীর বিরুদ্ধে স্বর শিরদাঁড়া সোজা রেখে শোনা গেল। বিচলিত গান্ধীজী কথা বলতে চাইলেন পুলিনবাবুর সঙ্গে। যে বৈঠক হয় চিত্তরঞ্জন দাসের বাড়িতে যা রাজনৈতিক মহলে বিরাট আলোড়ন ফেলে।

১৯২০ সালে ভারত মায়ের এই বীর সন্তান গঠন করেন 'ভারত সেবক সঙ্ঘ'। ১৯২২ সালে ভারত সেবক সঙ্ঘকে ভেঙে দিয়ে ১৯২৮ সালে কলকাতার মেছুয়া বাজারে প্রতিষ্ঠা করলেন বঙ্গীয় ব্যায়াম সমিতি। এই আখড়ায় তরুণদের লাঠি, তলোয়ার চালনা ও কুস্তি শেখানো হতো। ১৯৩০ সালে তৎকালীন কলকাতা পুরসভার মেয়র সুভাষচন্দ্র বসু পুলিনবিহারীর সঙ্গে সশস্ত্র বিপ্লবে আত্মনির্ভরতার ভাবনার মিল খুঁজে পান। পুলিনবিহারীর কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ বঙ্গীয় ব্যায়াম সমিতিকে ২০ কাঠা জমি দান করে কলকাতা পুরসভা। তখন থেকে আমৃত্যু পুলিনবিহারীর সাধনাস্থল ছিল বঙ্গীয় ব্যায়াম সমিতি। যা পুলিন দাসের আখড়া নামে পরিচিত। হায়রে বাঙ্গালি! আজ সে স্থান এক বিয়ে বাড়িতে পরিণত হয়েছে।

পুলিনবিহারী দাসের কর্মের ব্যাপ্তি এক লপ্তে বর্ণনা করা প্রায় অসম্ভব। একাধারে প্রবাদপ্রতিম বিপ্লবী, অন্যদিকে এশিয়া মহাদেশের আধুনিক মার্শাল আর্টের অন্যতম পথিকৃৎও তিনিই। আধুনিক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম নিয়ে পুলিনবিহারী রচিত বই পড়ে বিস্মিত হয়েছিলেন পঞ্চম জর্জ স্বয়ং। সে যুগে পুলিনবাবুর থেকে মন্ত্রণা পেয়ে উজ্জীবিত হন সুভাষচন্দ্র বসু, বিপ্লবী সূর্য সেন, ডাক্তার হেডগেওয়ার, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী প্রমুখ। পুলিনবিহারী দাস ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যে লড়াইটা শুরু করেছিলেন, মাথা উঁচু করে বাঁচার মন্ত্র জাগিয়েছিলেন, সেই মন্ত্র আজও দেশের যুবক-যুবতীদের উদ্বুদ্ধ করতে পারে। পুলিনবিহারী দাসই প্রথম আত্মনির্ভরতার কথা বলেছিলেন। স্বপ্ন দেখেছিলেন এক শক্তিশালী ভারতের।

(লেখক : বিপ্লবী-পুলিনবিহারী দাসের পৌত্র)

রাইটার্সের অলিন্দ যুদ্ধ ও বাঙ্গালির সংজ্ঞা

মিলন খামারিয়া ও কল্যাণ চক্রবর্তী

বাঙ্গালির ব্রিটিশ স্তাবকতাকে ব্যঙ্গ করে সুকুমার রায় লেখেন, 'হুঁকো মুখো হ্যাংলা/বাড়ি তার বাংলা।' এই হ্যাংলা বাঙ্গালি ব্রিটিশ প্রভুর জুতো চাটতো আর ব্রিটিশরা তাদের 'নেটিভ' বলে ঘৃণা করতো। রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালির বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 'দুরন্ত আশা' কবিতায় বলেন,

'ভদ্র মোরা, শান্ত বড়ো,
পোষ-মানা এ প্রাণ
বোতাম-আঁটা জামার নীচে
শান্তিতে শয়ান।'

'বঙ্গমাতা' কবিতায় রবীন্দ্রনাথকে আরও বলতে দেখা যায়,

'সাত কোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননী,
রেখেছ বাঙ্গালি করে, মানুষ করনি।'

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের মতে বাঙ্গালি 'মানুষ' পদবাচ্য হয়ে উঠছে না। তাহলে 'মানুষ' হতে গেলে কী করতে হবে? তার বর্ণনা পাই কুসুম কুমারী দাশের 'আদর্শ ছেলে' কবিতায়,

''আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে
কথায় না বড়ো হয়ে কাজে বড়ো হবে?
মুখে হাসি বুকে বল, তেজে ভরা মন
'মানুষ হইতে হবে'—এই যার পণ।''

এসব বর্ণনা বাস্তব। কিন্তু কোনো কোনো বাঙ্গালি এমনও জন্মান, যাঁরা 'ব্যাঘ্রে-বৃষভে' সমন্বয় ঘটান। তেমনই বাঙ্গালি যুবক ছিলেন বিবেকানন্দ, তেমনই ছিলেন বিনয়-বাদল-দীনেশের মতো গুপ্ত-বিপ্লবীর দল। তারা শান্ত ছিলেন, ভদ্রও ছিলেন। কিন্তু নিদ্রিত ভারতকে জাগানোর আগুন ছিল তাঁদের মধ্যে, দেশপ্রেমের আগুন জ্বালানো ছিল তাদের প্রাণে। তাঁরা 'পোষ-মানা' বাঙ্গালি ছিলেন না। 'সুপ্ত হয়ে লুপ্ত হয়ে' গুপ্তবাসের গৃহী-বাঙ্গালি নন। 'বোতাম-আঁটা জামার নীচে শান্তিতে শয়ান' ছিল না তাঁদের। 'তৈল-ঢালা স্নিগ্ধ তনু/নিদ্রারসে ভরা' দেহও তাঁদের নয়। তাঁরা নিমেষে বিকট উল্লাসে সব কিছু ছিঁড়ে ছুটে যাওয়া বাঙ্গালি; রুদ্ধ-প্রাণ মুক্ত করার বাঙ্গালি। তাঁরা মদ্যসম পান করতে চেয়েছেন মুক্ত

ভারতবর্ষের সুধা, শূন্য-ব্যোম অপরিমাণ দেশমাতৃকা চেয়েছেন।

শান্ত যুবক সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ একদিন ট্রেনে উঠে পড়েন ব্রিটিশদের কামরায়। কামরায় বসে ছিলেন দু'জন গোরা সৈন্য। স্বামীজীকে দেখে একজন তাঁর বুদ্ধির সমালোচনা করে বলেন, 'The Ass is coming'। অন্য জন তাঁর শ্যামলা গাত্রবর্ণ দেখে বলেন, 'No, there is a goat.' স্বামীজী ধীর গতিতে এসে তাদের মাঝখানে বসলেন এবং দু'জনের দিকেই একবার করে তাকিয়ে নিয়ে মৃদু হেসে বললেন, 'I am sitting between the two.' স্বাজাত্যবোধ- জাত প্রতিবাদ আজকের যুবকদের শিখতে হবে তাঁর জীবনাচরণ থেকে।

৮ ডিসেম্বর, ১৯৩০; রাইটার্স বিল্ডিং অভিযান করলেন তিন অসীম সাহসী বাঙ্গালি। 'অলিন্দ যুদ্ধ'-র তিন মহানায়ক সেদিন বাঙ্গালির সংজ্ঞা-স্বরূপ দিয়েছিলেন বদলে। বিনয় বসু, যাঁর জন্ম ১৯০৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর, অভিযানকালে বয়স মাত্র ২২। বাদল গুপ্ত, জন্ম ১৯১২ সালে, বয়স হয়েছিল ১৮। দীনেশচন্দ্র গুপ্ত, জন্ম ১৯১১ সালের ৬ ডিসেম্বর, বয়স তখন মাত্র ১৯ বছর।

এদের তিন জনের হাতেই পিস্তল। অত্যাচারী পুলিশ অফিসারদের সাজা দেবেন, এই প্রতিজ্ঞা। ব্রিটিশ পুলিশে ত্রাস জাগাতে তাঁরা মরিয়া, যাতে দেশের মানুষকে অত্যাচার করার সাহস না পায়। কুখ্যাত ইন্সপেক্টর জেনারেল সিম্পসন সাহেবকে দুর্ভেদ্য রাইটার্স ভবনের মধ্যেই খতম করবেন, এই দৃঢ়তা ছিল। সুসম্পন্ন হলো সেই কাজ। তারপর পুলিশের সঙ্গে চললো অসম- সাহসী, ঐতিহাসিক অলিন্দ-যুদ্ধ। রাইটার্স বিল্ডিঙে এখনও তার অমোচ্য ইতিহাস স্মৃতি হয়ে আছে। আগ্নেয়াস্ত্রের গুলি ফুরোলো; কিন্তু তাঁরা ধরা দিতে চান না। বাদল গুপ্ত পটাশিয়াম সায়ানাইড খেলেন এবং অচিরেই মৃত্যুমুখে ঢলে পড়লেন। বিনয় বসু নিজেকে গুলিবিদ্ধ করলেন। দীনেশও তাই করলেন। বিনয় ব্রিটিশের ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গেলেন। দীনেশকে বাঁচিয়ে তুলে ব্রিটিশ-বিচারে ফাঁসিকাঠে ঝোলালো আদালত। তাঁরা কিন্তু আজও মরেননি, দেশের মুক্তির ইতিহাসে অমর হয়ে রয়েছেন। রাইটার্স বিল্ডিং মানে ইংরেজ প্রশাসকের কলম-কালি পেশার দম্ভের অট্টালিকা নয়; রাইটার্স বিল্ডিং মানে কয়েক দশকের লালফিতে- সুলভ লালবাড়ির অধ্যাদেশও নয়। রাইটার্স বিল্ডিং মানে বিনয়-বাদল- দীনেশের রক্তলেখা এক হারিয়ে যাওয়া বাঙ্গালির বীরত্বের অমর ইতিহাস।

পূর্ববঙ্গ, পূর্ব পাকিস্তান হয়ে বর্তমান বাংলাদেশের বিক্রমপুরের ভূমিপুত্র ছিলেন এই তিন বাঙ্গালি। কিন্তু বিক্রমপুর কি তাঁদের মনে রেখেছে? কেমন আছেন সেখানকার বর্তমান বাঙ্গালি? অত্যাচার কি বন্ধ হয়েছে? 'অন্নপায়ী বঙ্গবাসী/স্তন্যপায়ী জীব' তক্তাপোশে জটলা করে একবারও কি সেই আলোচনা করবেন না! □

কমিউনিস্টদের ধিক্কার

ইহুদি জাতি ৩৩০০ বছরের এক প্রাচীন জাতি। তাদের মাতৃভূমি জেরুজালেম তথা ইজরায়েল। তারা বহু বছর তাদের মাতৃভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। কিন্তু তারা কখনোই তাদের মাতৃভূমিকে ভুলে যায়নি। বহু লড়াইয়ের পর তারা তাদের মাতৃভূমিতে ফিরে আসে। মাতৃভূমিতে ফিরেও তাদের শান্তির নিঃশ্বাস ফেলতে দেয়নি আরব দেশগুলি। রবীন্দ্রনাথের কথায় পৃথিবীতে দুটি জাতি হলো মুসলমান ও খ্রিস্টান যারা নিজেদের ধর্ম পালন করেই খুশি নয় অন্যের ধর্ম ধ্বংস করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এই প্রতিবেশী মুসলমান দেশগুলির মদতে ও অর্থানুকূল্যে গাজা স্ট্রিপে একটি জঙ্গি সংগঠন গড়ে ওঠে যার নাম হামাস। এই হামাস সবসময় ইজরায়েলের ক্ষতি সাধন করে চলেছে এবং নৃশংসতা চরম সীমায় পৌঁছেছে। পরে এই সংগঠনকে আমেরিকা-সহ পৃথিবীর সকল প্রভাবশালী দেশ জঙ্গি সংগঠন হিসেবে ঘোষণা করে।

৭ অক্টোবর হামাস তাদের নৃশংসতার সীমা ছাড়িয়ে যায়। গাজা স্ট্রিপ থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে ইজরায়েলে ধর্মীয় মেলা চলছিল, সেখানে প্রায় ২-৩ হাজার সাধারণ ইজরায়েলবাসী অংশগ্রহণ করেছিলেন। সেই মেলায় হামাসের জঙ্গিরা এলোপাথাড়ি গুলি চালায়। রকেট নিক্ষেপ করে। অনেককে বন্দি করে নিয়ে যায়। এই নৃশংসতার প্রত্যুত্তরে ইজরায়েল তাদের ওপর প্রত্যাঘাত শুরু করে। এতক্ষণ চুপ করে থাকা কমিউনিস্টরা ইজরায়েলের ওপর হামাসের হামলা অনৈতিক বলে মনে হয়নি। হামাস তাদের চোখে ধোয়া তুলসী পাতা। হামাসের ওপর প্রত্যাঘাত শুরু হতেই তাদের দরদ উথলে উঠতে শুরু করেছে। কমিউনিস্টরা চিরকালই সন্ত্রাসবাদের সমর্থক। এদের ধিক্কার জানাই।

—তুষার কান্তি সামন্ত,
হলদিয়া।

অকৃতজ্ঞ

বিশ্ব ক্রিকেটে ভারতের পরাজয়ে বাংলাদেশিদের আনন্দ ও উচ্ছ্বাস প্রকাশের রহস্যটা কী? পাকিস্তান যখন সেনা পাঠিয়ে বাংলাদেশিদের খতম করতে উদ্যত হয়েছিল এবং প্রায় ৩০ লক্ষ পুরুষ ও মহিলাকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল, তখন ভারতীয় সেনা প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে পাকিস্তানি সেনাদের বন্দি করে বাংলাদেশিদের রক্ষা করে এবং বাংলাদেশি মহিলাদের জীবন এবং সম্ভ্রম রক্ষা করে। ভারতীয় সেনারা ৯৩ হাজার পাক সেনা বন্দি করে ভারতে নিয়ে আসে। রক্ষা পায় বাংলাদেশিরা। শেখ মুজিবুর রহমান বন্দিদশা থেকে মুক্তি পান এবং বাংলাদেশ স্বাধীন দেশে পরিণত হয়। সেই বাংলাদেশের বর্তমান প্রজন্ম কি জানে না কীভাবে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?

ভারতীয় সেনাদের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ ছাড়া বাংলাদেশ সেদিন খতম হয়ে যেত। তাহলে বাংলাদেশের বর্তমান প্রজন্ম কী নিজেদের পাকিস্তানের নাগরিক হিসেবে পরিচয় দিতে না পারার জন্য মর্মাহত? আমার প্রস্তাব, এখন থেকে সুচিকিৎসার জন্য বা অন্য কারণে বাংলাদেশিদের ভারতে প্রবেশের জন্য ভিসা বা কোনও অনুমতিপত্র না দেওয়া হয়। তারা একশোভাগ অকৃতজ্ঞ।

—শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়,
ডেজিরে কমপ্লেক্স, বড়বাজার,
চন্দননগর।

আবার প্রমাণিত হলো বাংলাদেশ অকৃতজ্ঞ

বিশ্বকাপ ক্রিকেটে বাংলাদেশের কিছু মানুষের আনন্দ-উৎসব হিন্দু বিদ্বেষ থেকে উৎসারিত। পাকিস্তান ও বাংলাদেশে মজ্জাগত, এ থেকে বেরিয়ে আসার কোনো পথ নেই। এজন্যে পাকিস্তান হিন্দুশূন্য, বাংলাদেশ হিন্দুশূন্য হবার পথে। অস্ট্রেলিয়া যোগ্য দল হিসেবে ভালো খেলে জিতেছে, তাঁদের অভিনন্দন। ভারত শক্তিশালী দল, অপরাজিত ছিল, হেরেছে ফাইনালে। লেখা হচ্ছে, 'হারি-জিতি' নাহি লাজ। ভারতবাসী দুঃখ পেয়েছে, কিন্তু অস্ট্রেলিয়াকে অভিনন্দন জানাতে ভুল করেনি। পক্ষান্তরে বাংলাদেশে ভারতের পরাজয়ে আনন্দের বন্যা বয়ে গেছে।

না, এটি কোনো গোপন বিষয় নয়, বাংলাদেশের দর্শক প্রকাশ্যেই বলেছেন, ভারত হারায় তাঁরা ঈদের আনন্দ উপভোগ করছেন। বাংলাদেশের 'দি নিউজ বাংলা' হেডিং করেছে, 'ভারতের হার, বাংলাদেশের উৎসব'। একজন কোনো জাহাঙ্গির আলম সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, ' মানুষ এত বেইমান হয় কী করে, শুধুই আনন্দের জন্যে ? — ছিঃ, বাংলাদেশ ছিঃ! তাঁর পোস্টে ভারতের কোনো শুভাশিস ভট্টাচার্য লিখেছেন, ' যে কেউ অস্ট্রেলিয়াকে সাপোর্ট করতেই পারে, কিন্তু কারণ জানতে চাইলে বলা হলো, 'ভারত মুসলিম রাষ্ট্র নয়।' অস্ট্রেলিয়াও তো মুসলিম রাষ্ট্র নয়, তাহলে? বিষয়টি ভারত নয়। বিষয়টি হিন্দু। ভারত আর হিন্দু সমার্থক। ভদ্রলোক লিখেছেন, 'বিষয়টি পরিষ্কার-- অ্যান্টি হিন্দু। ভারতের টিমে মোহাম্মদ সামি, সিরাজ আছে। তাঁরা চমৎকার খেলেছেন, তাহলেও হবে না, হিন্দুর সঙ্গে থাকলে চলবে না।' ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের সাবেক গভর্নর তথাগত রায় বলেছেন, 'বাংলাদেশ অকৃতজ্ঞ, ফের এর প্রমাণ দিল।'

একজন চমৎকার একটি হাইপোথিটিক্যাল প্রশ্ন করেছেন, তিনি জানতে চেয়েছেন, ফাইনাল খেলাটি যদি ভারত ও ইজরায়েলের মধ্যে হতো এবং ইজরায়েল জিততো, তাহলে বাংলাদেশিরা কী করতেন? আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, তারা খেলাটি 'বয়কট' করত। এক ভারতের জ্বালায় বাঁচি না, এর ওপর ইজরায়েল!

—শিতাংশু গুহ,
নিউইয়র্ক।

ফঃ ৩

শীত ও শীতের পরের রোগের চিকিৎসা

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

শীত এসে গেছে। শীতের শুরু ও শেষে একটু সাবধান হলে অনেক অসুখ বিসুখ থেকে নিরাপদ থাকতে পারেন। আবওহাওয়া না গরম না ঠাণ্ডা হওয়ায় জীবাণু সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং দেখা দেয় সর্দি, কাশি, জ্বর, অ্যাজমা, শুষ্ক ত্বকের সমস্যা, আচমকা নাক থেকে রক্তপাত, অ্যালার্জি, ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া, সাইনুসাইটিস, টনসিলাইটিস, ফ্যারিনজাইটিস, আর্থ্রাইটিস, মাথাব্যথা, চিকেন পক্স, হামের মতো হাজারো রোগ। এগুলো বেশি হয় শিশু এবং বেশি বয়সের মানুষের।

শীতের শুরুতে : সর্দি-জ্বর-কাশি সঙ্গে থাকতে পারে গা ম্যাজম্যাজে, মাথাধরা, নাক দিয়ে জল পড়া, অজস্র হাঁচি। এগুলো কম শীত-পোশাক পড়ার জন্য ঠাণ্ডা লেগে হতে পারে কিংবা অতিরিক্ত গরম জামা পরায় ঘাম বসেও হতে পারে। কিছুদিন বিশ্রাম এবং সেই সঙ্গে লক্ষণ অনুযায়ী রাসটক্স, ব্রায়োনিয়া, হেপারসালফার, জেলসিমিয়াম, ইউপেটোরিয়াম চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী গ্রহণ করলে মোটামুটি সাতদিনেই সেরে যায়।

নাক দিয়ে রক্তপাত : অনেকের ধারণা, ঠাণ্ডায় জল কম খাওয়ার দরুন শরীর কষা হয়। নাক দিয়ে রক্ত পড়ে, এই ভাবনাটি একবারেই ভুল। নাকে কোনোভাবে সংক্রমণ হলে ব্লিডিং হয়। শীতে বেশি হলেও অন্য ঋতুতেও নাক দিয়ে রক্ত পড়তে পারে। এর হাত থেকে বাঁচতে সহজ হলো নাকের ভেতরটা কখনই ড্রাই বা শুকনো হতে দেবেন না। এছাড়া লক্ষণ অনুযায়ী সাইট্রিক অ্যাসিড-২০০, হ্যামামেলিস-২০০, ভাইপেরা প্রভৃতি ওষুধ ব্যবহার করলে উপকার পাবেন।

অ্যাজমা : এটি শ্বাসনালীর প্রদাহ। রোগটা ক্রনিক, সমস্যা আচমকা শুরু হয়। বাতাস চলাচলের পথে অর্থাৎ শ্বাসনালী সরু হয়ে গিয়ে পরিমাণ মতো বাতাস ফুসফুসে আসতে পারে না। তখনই শুরু হয় শ্বাসকষ্ট। ঘুসঘুসে কাশি, বুকে চাপ ধরা ভাব, পশুর লোম, পরিবেশ দুষণ, ধুলো, ফুলের রেণু, বেগুন, চিংড়ি, কাঁকড়া এবং টেনশন ও বংশগত কারণ থেকে অ্যাজমা হয়। ঋতু পরিবর্তনের সময় আর শীতে বেশি দেখা যায়। শ্বাসকষ্ট কমাতে আর্সেনিক অ্যালবা-২০০-র সঙ্গে অ্যাসপিডোস্পার্মা মাদার দশ ফোঁটা করে খেলে উপকার হবে। এছাড়া চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী এরালিয়া, লোবেলিয়া ইনফ্ল্যাটা আর্স, হেপার সালফার, স্পঞ্জিয়া প্রভৃতি ওষুধ ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়।

ব্রঙ্কাইটিস : ব্রঙ্কাইটিস মানে অক্সিজেনবাহী টিস্যুতে সংক্রমণ, সর্দি-কাশি, অ্যালার্জি, অ্যাজমার রোগীকে চট করে এই রোগে কাবু করে। টানা সর্দি-কাশি-জ্বর, কখনো বুকে ব্যথা, বুকে সাই সাই শব্দ আর শ্বাসকষ্টের লক্ষণ। লক্ষণ অনুযায়ী হোমিওপ্যাথি ওষুধ গ্রহণ করলে উপকার পাবেন। ঠাণ্ডা এড়াতে রোগীকে গরম জামাকাপড় পরতে হবে আর ঠাণ্ডা, স্যাঁতসেঁতে পরিবেশ থেকে দূরে থাকতে হবে। ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করতে হবে।

নিউমোনিয়া : অনেকেই ব্রঙ্কাইটিসের সঙ্গে রোগটিকে গুলিয়ে ফেলেন। এতেও সর্দি-কাশি, জ্বর, বুকে ব্যথা শ্বাসকষ্ট হয়। নিউমোনিয়া মানে ফুসফুসের টিস্যুতে সংক্রমণ, কিছু ক্ষেত্রে ব্রঙ্কাইটিস থেকে নিউমোনিয়া হতে পারে। লক্ষণ অনুযায়ী হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করলে সমস্যার সমাধান সহজ হয়ে যায় হোমিওপ্যাথিতে রোগের চিকিৎসা করে না, রোগীর চিকিৎসা করে।

টনসিলাইটিস, ফ্যারিনজাইটিস : গলার ভিতরে দু'পাশের দুটি গ্লান্ডের নাম টনসিল। শরীরের ভেতরে অবাঞ্ছিত জীবাণুর প্রবেশ আটকায়। তাই এদের

মানবদেহের দারোয়ান বলা হয়। কোনোভাবে জীবাণু ও দূষণ থেকে সংক্রমণ হলে টনসিলে প্রদাহ দেখা দেয়। এটাই টনসিলাইটিস। এর থেকে গলাব্যথা, টনসিল ফুলে লাল হওয়া, ফ্যারিনজাইটিস, টনসিলে পুঁজ জমা, কানে-মাথায় ব্যথা, স্বরভঙ্গ, স্বর বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো ঘটনা ঘটে। ফ্যারিনজাইটিস হলে গলায় প্রথমে ছোটো গুটি দেখা দেয়, পরে তা পেকে আকারে বড়ো হয়ে যায়। কিছু খেতে বা তরল খাবার গিলতেও কষ্ট হয়। এক্ষেত্রে গার্গেল, থ্রোট সোয়ার কালচার ইত্যাদি করতে বলা হয়। এই সময়ে ধূমপান একেবারেই নয়। ধোঁয়া, ধুলো থেকে দূরে থাকবেন, অ্যালোপ্যাথিক নাইস জাতীয় ওষুধ কখনোই খাবেন না। লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসকের পরামর্শ মতো হোমিওপ্যাথি ওষুধ বিশেষ ফলপ্রসূ।

হাই ব্লাড প্রেসার : অনেকের জানা নেই যে শীতে রক্তচাপ বাড়তে পারে। অত্যধিক ঠাণ্ডায় রক্তনালী সংকুচিত হয়ে এই সমস্যা হয়। ঠাণ্ডা তো লাগাবেন না, উপরন্তু নিয়মিত প্রেসার চেক করাবেন। এক্ষেত্রে স্পারটিয়াম স্কোপেরিয়াম এবং রাউলফিয়া মাদার চিকিৎসকের পরামর্শ মতো গ্রহণ করলে উপকার পাবেন।

ড্রাই স্কিন : এই ধরনের স্কিনের সমস্যা অনেকের ত্বক ফেটে যাওয়া সোরিয়াসিস, ড্রাই খুশকি, ড্রাই একজিমা ইত্যাদি। খুশকি হলে তেল মাখবেন না। একদিন অন্তর শ্যাম্পু করুন। কন্ডিশনার মাখুন, অ্যালোভেরা ক্রিম ব্যবহার করুন এবং হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা গ্রহণ করুন।

আর্থ্রাইটিস : অনেকের ঠাণ্ডায় আর্থ্রাইটিসের ব্যথা বাড়ে। যন্ত্রণা থেকে বাঁচতে ঠাণ্ডা লাগাবেন না। সারা বছর ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করুন। ব্যথার জায়গায় হট কমপ্রেস করতে পারেন। কচু, ওল, মুসুরডাল, টমেটো, পালং ও পুঁই শাক, চিংড়ি, কাঁকড়া, পোস্ত, ছোলা, শিম, বাঁধাকপি খাবেন না। লক্ষণ অনুযায়ী হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করলে উপকার পাবেন।

সাইনুসাইটিস : সাইনাস এরিয়া (কপালের পেছনের দিকে নাকের হাড়, চোখ আর নাকে) প্রচুর সর্দি জমে বা জীবাণু সংক্রমণে হাওয়া চলাচলের পথ বন্ধ হয়ে গেলে সমস্যাটি দেখা দেয়। সর্দি-কাশির ধাত থাকলে সহজেই রোগটির আক্রমণ ঘটে। শ্বাসকষ্ট, নাকবন্ধ হওয়া ও জল পড়া, কোনো কিছু গন্ধ না পাওয়া গেলে গলা, মাথায় চাপ ধরা, ব্যথা, রাতে খুব কাশি ও জ্বর, শরীরে ক্লান্তিও গলায় ঘা হয়। লক্ষণ অনুযায়ী সেঙ্গুইনেরিয়া, ওনোস মোডিয়াম, হেপার সালফার, আর্সেনিক চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী গ্রহণ করলে উপকার পাওয়া যাবে।

শীতের শেষে ইনফ্লুয়েঞ্জা : অ্যাজমার চিকিৎসার কথা শুরুতেই বলা হয়েছে। চিকেন পক্সে, ভেরিওলিনাম চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী গ্রহণ করলে রোগ প্রতিরোধ সম্ভব। দ্রুত আরোগ্যের জন্য রাসটক্স-২০০ ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়। গলায় ক্ষত থাকলে মার্কসল-৩০, পক্সের দাগ কমাতে বারবারিস অ্যাকুইফেলিয়াম মাদার অল্পজলে ১৫ ফোঁটা মিশিয়ে রাতে একবার মাখুন। হামে বেলেডোনা-৩০, হামের সঙ্গে পেটের অসুখ থাকলে পালসেটিলা। পক্স বা হামের কারণে দুর্বল হলে চায়না মাদার ১০ ফোঁটা করে খাওয়ালে উপকার পাওয়া যায়। হামের পর বেশি চামড়া উঠলে আর্সআয়ো 3 × (পাউডার) হোমিওপ্যাথি চামচের পাঁচ চামচ খাওয়ালে উপকার পাওয়া যাবে।

সতর্কতা :

(১) সারা বছর ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করলে শরীর সুস্থ থাকে।

(২) অম্বল, গ্যাসের সমস্যায় ভরা পেট খাবেন না। রাতের খাবার তাড়াতাড়ি খাবেন।

(৩) প্রচুর জল খান, চামড়া নরম থাকবে, গ্যাস, অম্বল কম হবে।

(৪) অ্যালার্জির ধাত থাকলে অ্যালার্জির কারণ থেকে দূরে থাকুন।

(৫) শীতের শুরু ও শেষে হালকা গরম পোশাক পরবেন।

(৬) পক্স, হামেও মাছ-মাংস খান, এতে দুর্বলতা কমবে।

স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলি পালন করুন, প্রয়োজনে ওষুধ খান, তাহলে শীতকে পুরোপুরি উপভোগ করতে পারবেন।

যোগাযোগ : ৯৮৩০০২৩৪৮৭

(লেখক সভাপতি ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অব হোমিওপ্যাথি)

শীতের হরেক রকমের খাবার

সুতপা বসাক ভড়

দুর্গাপূজার সময় থেকে প্রকৃতিতে একটা পরিবর্তনের পালা চোখে পড়ে। পরিবেশ দূষণ, বিশ্ব উষ্ণায়ণ, প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হওয়া সত্ত্বেও ঋতু পরিবর্তনের স্পষ্ট ইঙ্গিত প্রকৃতি আমাদের দেয়। এই সময় বাজার-হাটে শীতের কিছু বিশেষ সবজি আসতে শুরু করে। বিজ্ঞানের কল্যাণে সারা বছরই আমরা সকল ঋতুর সবজি পাই। কিন্তু 'যে সময়ের-যা'; অর্থাৎ যে ঋতুর সবজি বা ফল, সেই ঋতুতেই ভালোভাবে তা হয়ে থাকে এবং তার স্বাদ-গন্ধও হয় অতি উত্তম।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে চায়ের অভ্যাস আমাদের প্রায় সবারই আছে। শীতের সকালে লিকার চায়ে একটু আদা-তুলসীপাতা, সামান্য মধু দিলে অতুলনীয় স্বাদ ও গন্ধ পাওয়া যায়। শরীরের জন্যও এটি খুব উপকারী।

শীতের জলখাবারে নতুন আলু, কড়াইশুঁটি দিয়ে আলুর দম একটি সুস্বাদু খাবার, যা মুড়ি-রুটি-পরোটা, লুচি-ভাত সবকিছুর সঙ্গেই চেটেপুটে খাওয়া যায়। বাজারে আলুর দমের জন্য ছোটো ছোটো নতুন আলু কিনতে পাওয়া যায়। কড়াইতে সরষের তেল গরম করে তাতে জিরে অথবা পাঁচফোঁড়ন, তেজপাতা, কাঁচালঙ্কা দিয়ে আলু-মটর ছেড়ে দিতে হবে। সামান্য নুন দিয়ে মিনিট পাঁচেক নাড়াচাড়া করে ছোটো করে কাটা টমেটো, আদাবাটা, হলুদ, লঙ্কা বাটা দিয়ে একটু কষিয়ে নিয়ে জল দিয়ে কম আঁচে ঢাকা দিয়ে খানিকক্ষণ রাখলে আলু-কড়াইশুঁটি সেদ্ধ হয়ে যাবে। কয়েকটা আলু খুন্তি দিয়ে ভেঙে দেওয়া যেতে পারে। সেদ্ধ হলে ওপর থেকে ধনেপাতা কুঁচি ছড়িয়ে দিলেই তৈরি বাঙ্গালির বিখ্যাত আলুর দম।

শীতে নানান রকম শাক পাওয়া যায়, যেমন— পালং, বেতো, মেথি। এগুলি আলাদা ভাবে ভালো করে ধুয়ে জিরে অথবা পাঁচফোড়ন, তেজপাতা, কাঁচালঙ্কা এবং শুধুমাত্র নুন-হলুদ দিয়ে রান্না করলে তা খুবই উপাদেয় হয়।

পালংশাক দিয়ে বড়া, পাঁচমেশালি সবজি রান্না করলেও খুব ভালো লাগে। মুসুরডাল ও বেতোশাক একসঙ্গে সেদ্ধ করে কালোজিরে, শুকনো লঙ্কা, তেজপাতা দিয়ে রান্না করে খেতেও ভালো। আবার কালোজিরে, শুকনোলঙ্কা সাঁতলে মেথি এবং ছোটো করে কাটা বেগুনের তরকারিও খুব উপাদেয়। শীতকালে নতুন বেগুন ভাজা ও পোড়া খাওয়া হয়ে থাকে। রান্নার আগে বেশ খানিকক্ষণ বেগুন কেটে জলে ভিজিয়ে এবং নুন-মিষ্টি হলুদ মাখিয়ে রাখলে একদম মুখ চুলকায় না।

ফুলকপি শীতের সবজি। আলু-ফুলকপি ভাজা, আলু ফুলকপির তরকারিও আমাদের অতি জনপ্রিয় খাবার। ফুলকপি রান্নার সময় তেলের মধ্যে গোটা গোলমরিচ কয়েকটি দিলে গ্যাসের কোনো সমস্যা হয় না। আবার কড়াইশুঁটি, টমেটো দিয়ে বাঁধাকপিও খুব সুস্বাদু হয় এই সময়। এইসময় মিষ্টি মুলো ওঠে, খোসা ছাড়িয়ে কাঁচা মুলো খুবই উপাদেয়। এছাড়া মুলোশাক কুচিয়ে, একটু ভাপিয়ে সরষের তেলে রসুন-কালোজিরে, শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে খেতে খুবই ভালো লাগে। মুলো ছেঁচ্‌কি, মুলোর ডাল, পাঁচমেশালি তরকারিতে মুলোর একটি বিশেষ স্বাদ ও স্থান আছে। এদিকে শিম সেদ্ধ করে, ভেজে, আলু দিয়ে মাখামাখা তরকারি, নিরামিষ, আমিষ সবেতেই অতুলনীয় স্বাদ এনে দেয়। আলু-পেঁয়াজকলির নাম নিতেই হয়। বিট-গাজর-কড়াইশুঁটির তরকারিও এইসময় ঘরে ঘরে হয়ে থাকে। মূলত রান্নার শেষে ধনেপাতা কুচি শীতের বেশিরভাগ রান্নাতেই ব্যবহার হয়। মাছের মধ্যে ট্যাংরা, কাকিলা, মৌরলা, কাচকি, চিতল, ফলি, ভেট্‌কি মাছ ভালোই ওঠে। এগুলি মূলত রসুন, কালোজিরে, ধনে, জিরে, হলুদ, লঙ্কা বাটা, ধনেপাতা ইত্যাদির স্বাদ-গন্ধের ওপর নির্ভর করে রান্না করা হয়ে থাকে।

শীতের কড়াইশুঁটির কচুরি, খিচুড়ি খাদ্যতালিকায় বিশেষ গুরুত্ব পায়। ফলের মধ্যে রয়েছে আখ, সবেদা, কমলালেবু ইত্যাদি। নতুন চাল, নতুন খেজুর গুড় অর্থাৎ চালের তৈরি নানারকম পিঠে-পুলি- পায়েস। এছাড়া নলেন গুড়ের রসগোল্লা, সন্দেশ, নানারকম মিষ্টান্ন তো আছেই। এই সময়ে বাইরের খাবার না খেয়ে পরম্পরাগত রান্নাগুলি করা যেতেই পারে। শীতকালে রান্নাঘরে কাজ করতেও কষ্ট হয় না। সুতরাং, আমাদের বিশেষ কিছু ব্যঞ্জন আমরা আমাদের রান্নাঘরে করার চেষ্টা করব। আবার শীত ঋতু তো আমাদের সামনে খাদ্যসম্ভার নিয়ে হাজির হয়। তবে আমরা নিজেদের শরীরের প্রতি লক্ষ্য রেখেই খাদ্যগ্রহণ করব। সীমিত পরিমাণে খেলে, তা শরীর ও মনে বলবৃদ্ধি করে। □

শরীরকে সারা বছর চাঙ্গা রাখার চাবিকাঠি শীতের শাকসবজি ও ফল

কথায় আছে শীতকাল মানেই নানা রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি। তার মোকাবিলায় শরীরের নানা রকম প্রয়োজনীয় ঘাটতিকে পূরণ করা আবশ্যক। সেই ঘাটতি কীভাবে পূরণ হবে, কীভাবে, কোন কোন খাদ্য নিয়ে আমাদের শরীর চাঙ্গা হবে, তা নিয়ে ডায়েট চার্ট বা খাদ্য তালিকা সংক্রান্ত আলোচনা করলেন ইনস্টিটিউট অব নিউরো সায়েন্সের মুখ্য পুষ্টিবিদ **মীনাক্ষী মজুমদার**।

শীতকাল মানেই নানারকম সবজি ও ফল পাওয়ার আদর্শ সময়। বিভিন্ন সবজি আমরা এই সময়ে পেয়ে থাকি। প্রত্যেকটি ভিটামিন সি, ফাইবার এবং অ্যান্টি অক্সিডেন্টে সমৃদ্ধ। শীতকাল যেহেতু শরীরের শুষ্কতা বাড়ায়, তাই এই সময়ে আমাদের খাদ্য তালিকায় সেই শুষ্কতা থেকে মুক্তি পাবার জন্য ঘরে তৈরি স্যুপ ও মরশুমি ফল রাখা দরকার।

এই শীতকালে শরীরের দরকারি নানা প্রোটিন, ভিটামিন-সহ নানা বিষয়ের যে ঘাটতি দেখা দেয়, সেটা পূরণ হয়। এই সময়ে বিভিন্ন ধরনের শাকপাতা, যেমন— পালংশাক, মেথিশাক, লেটুসপাতা পাওয়া যায়, সেগুলিতে ক্যালোরি খুবই কম থাকলেও, থাকে পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায় পটাশিয়াম, ডায়েটারি ফাইবার, ভিটামিন সি, আয়রন, ম্যাগনেসিয়াম। এসময় ফুলকপি, বাঁধাকপি, ব্রকলি, মটরশুঁটি, বিন্‌স, গাজর, বিট ইত্যাদিতে পাওয়া যায় মানব শরীরের প্রয়োজনীয় নানা মেজর ও ট্রেস এলিমেন্টস্‌। এইসব সবজিগুলি অত্যন্ত পুষ্টিকর, এগুলির অ্যান্টিইনফ্ল্যামেটরি এফেক্ট থাকে, যা একটি মানব দেহের পক্ষে খুব প্রয়োজনীয়। এগুলি হার্টের পক্ষে যেমন খুব দরকারি, তেমনি ক্যানসারের বিরুদ্ধেও প্রতিরোধ তৈরি করে। ত্বককে সুন্দর রাখতে সাহায্য করে। শরীরকে ডিটক্স করার ক্ষমতাও রাখে। এগুলি ফাইবার সমৃদ্ধ হওয়ায়, আমাদের শরীরের ওজন কমাতেও সাহায্য করে থাকে।

গাজর যথেষ্ট সুস্বাদু ও পুষ্টিকর। এতে বিটা ক্যারোটিন, ফাইবার, পটাশিয়াম এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে। এটি যেহেতু বিটা ক্যারোটিন সমৃদ্ধ, তাই এর থেকে আমাদের শরীর ভিটামিন ‘এ’ পেয়ে থাকে, যা দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে।

ভিটামিন-‘কে’ মানবদেহে রক্ত জমাট বাঁধতে এবং হাড়ের শক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। এটি রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণেও সাহায্য করে। শীতকালীন সবজি পালংশাক ও মূলো এই ভিটামিন-‘কে’-র উৎস। অন্যদিকে শীতকালে পাওয়া শাকসবজি থেকে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-‘বি’ পাওয়া যায়। যা শরীরে শক্তির উৎস হিসেবে কাজ করে থাকে।

বিটে ৮৮ শতাংশ জল থাকে। যা আমাদের শরীরে শীতকালে খুবই দরকার। এটি ফাইবার সমৃদ্ধ (২-৩ গ্রাম/১০০ গ্রাম)। এটি দেহকোষের বৃদ্ধি ও নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। গর্ভবতী মহিলাদের জন্য খুবই উপকারি। আরও একটি বিষয় বলা দরকার, এটি আয়রণ ও প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ হওয়ায় মহিলাদের জন্য বেশ দরকারি। ফলে খাদ্য তালিকায় উপরের সবগুলি বিষয়ের স্থান অধিকার করা উচিত।

এবারে আসা যাক শীতের ফলের কথায় :

শীতের সব ফলগুলিই ভিটামিন এবং মিনারেল সমৃদ্ধ। বিশেষ করে ভিটামিন সি সমৃদ্ধ কমলালেবু সাহায্য করে দেহের রক্তজালিকা, মাংস পেশি, কার্টিলেজ ও কোলাজেন মজবুত রাখতে সাহায্য করে। এছাড়াও অ্যাজমা, রিউমাটয়েড আর্থারাইটিস, ক্যানসার প্রতিরোধে সাহায্য করে। দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, যাতে কোনো ভাইরাস শরীরে বাসা বাঁধতে না পারে। তাঁর সঙ্গে আয়রণ বিশোষণে সাহায্য করে ও অ্যানিমিয়া দুর করে। ক্যালসিয়াম বেশি পরিমাণে থাকায় হাড়ের শক্তি বাড়ায়।

শীতে আমলকির উপকারিতা অনেক। ড্রাইফ্রুটস খাওয়া খুব জরুরি। এটি শরীরে উষ্ণতা বাড়ায়।

এবারে বলি সারা বছরের মতো মাছ, মাংস, ডিম পর্যাপ্ত পরিমাণে খেতে হবে। কারণ এগুলি আমাদের শরীরে প্রোটিনের ঘাটতি মেটায়। বিকেলে এগুলির সাহায্যে স্যুপ বানিয়ে খেতে পারেন।

সব শেষে বলি, খাদ্যরসিক বাঙালির খাদ্য তালিকায় অবশ্যই লেটুস স্যালাড, চিকেন স্যালাড, গ্রিণ পি স্যুপ, পালংপনির— কড়াই শুঁটির কচুরি এবং হালুয়া রাখতে পারেন।

(অনুলিখন : স্বপন দাস)

শীতকালে ত্বককে সুস্থ রাখতে প্রচুর জল ও সাদামাটা খাবার খান

(শীতকালে ত্বক শুষ্ক হয়ে তৈরি করে নানা সমস্যা। এই সময়ে আমরা কীভাবে ত্বকের যত্ন নেব, আলোকপাত করলেন কসমেটোলজিস্ট ডাঃ ইমরান ওয়ালী)

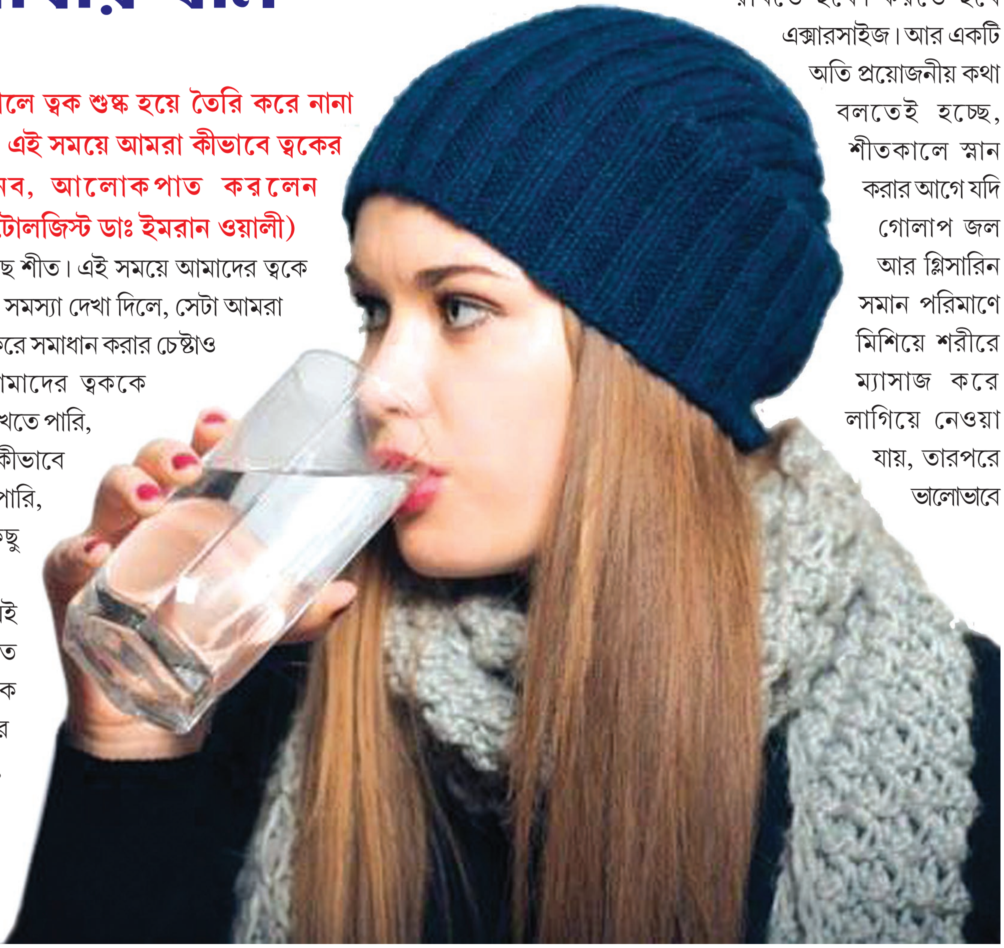

দুয়ারে কড়া নাড়ছে শীত। এই সময়ে আমাদের ত্বকে আসে নানা পরিবর্তন। সমস্যা দেখা দিলে, সেটা আমরা নিজের নিজের মতো করে সমাধান করার চেষ্টাও করি। এই শীতে আমাদের ত্বককে কীভাবে সমস্যা মুক্ত রাখতে পারি, শীতের কামড় থেকে কীভাবে ত্বককে রক্ষা করতে পারি, সেই বিষয় নিয়ে কিছু বলার চেষ্টা করব।

এই শীতের সময়েই আমাদের মধ্যে যত রকমের সামাজিক অনুষ্ঠান এসে হাজির হয়। যেমন বিয়ে, ফাংশান, কনফারেন্স ইত্যাদি নানা অনুষ্ঠান। যদিও এই করোনা অতিমারির পর একটু কম হচ্ছে, তবুও সাধারাণ বিধি নিষেধ উঠতেই আবার এই সব অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেছে করোনা স্বাস্থ্যবিধি মেনে। করোনার পরে, বিশেষ করে যাদের করোনা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে লক্ষ্য করছি যে, চুল ওঠার একটা প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। আর এই শীতের সময়ে এই চুল ওঠার বিষয়টা হয়েই থাকে, সেটা নিয়ে চিন্তা করবেন কিন্তু বেশি নয়। আর একটা বিষয়, করোনা অতিমারিতে স্বাস্থ্যবিধি মানার ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যক ছিল স্যানিটাইজার দিয়ে হাত ধোয়া। আর এই বেশি করে সাবান বা অ্যালকোহল দিয়ে হাত পরিষ্কার করার কারণে হ্যান্ড ডার্মাটাইটিস দেখা যাচ্ছে। এটা নিয়েও চিন্তা থাকলে চিকিৎসকের কাছে যাবেন ও পরামর্শ নেবেন। অবহেলা করবেন না। আর কোন্ জিনিস দিয়ে হাতকে জীবাণুমুক্ত করবেন, সেটা চিকিৎসকের পরামর্শ মেনেই করার চেষ্টা করবেন। মনে রাখবেন, বাজারে যে স্যানিটাইজার আছে, তাঁর সবগুলি আপনার পক্ষে ভালো নাও হতে পারে।

শীতের সময় ত্বককে সতেজ বা সুস্থ রাখার জন্য আমরা কী কী করতে পারি। একেবারে শুরুতেই বলি, আমাদের শরীরে এই সময়ে প্রচুর জলের দরকার হয়। সেই জল শরীরকে না দিলে, চামড়া শুষ্ক হবেই। এর থেকে মুক্তি পাবার একমাত্র উপায় প্রচুর পরিমাণে জল পান করা। আর খেতে হবে টাটকা ফলের রস। এছাড়া স্কিনটাকে হাইড্রেটেড করে রাখতে হবে। করতে হবে এক্সারসাইজ। আর একটি অতি প্রয়োজনীয় কথা বলতেই হচ্ছে, শীতকালে স্নান করার আগে যদি গোলাপ জল আর গ্লিসারিন সমান পরিমাণে মিশিয়ে শরীরে ম্যাসাজ করে লাগিয়ে নেওয়া যায়, তারপরে ভালোভাবে গ্লিসারিন সাবান দিয়ে স্নান করলে, আমাদের স্কিনটা হাইড্রেটেড ও মোলায়েম থাকে।

আমরা অনেকেই এই শীতে ময়শ্চারাইজার ব্যবহার করি ত্বককে সতেজ রাখতে। তাঁদের উদ্দেশ্য বলি, যে কোনো ময়শ্চারাইজার ব্যবহার করার আগে একবার চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন। অবশ্যই চর্মরোগ বিশেষজ্ঞের। মনে রাখবেন, আপনার ত্বকের চরিত্র ও চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে লোশন বা ময়শ্চারাইজার ব্যবহার করবেন। নচেৎ ত্বক কিন্তু খুব

সংবেদনশীল। যে কোনো কারণে কোনো অঘটন আপনার অজান্তেই ঘটে যেতে পারে।

আমরা চিকিৎসকরা শীতের সময় যে সব রোগী পাই, আর তাঁদের যে সব সমস্যা দেখতে পাই তাঁর মধ্যে হলো, অ্যাক্নে, যেটাকে আমরা পিম্পল বলে থাকি, খুসকি, সোরিয়াসিসের প্রবণতা বাড়তে দেখা যায়। অ্যাক্নে কেন-বেশি দেখা যায়, এর কারণ মেক-আপ। অনেকেই কম বেশি করে থাকেন। আমরা ঠিক মতো এই মেক-আপ করার পদ্ধতি জানি না। আর বিপদ আসে এখান থেকেই। স্কিনের অ্যালার্জি দেখা যায় এই কারণে। অ্যাক্নেও হয়, এটা মূলত মুখমণ্ডলে, হাতের উপরিভাগে, বুকের উপরিভাগে বেশ দেখা যায়। যাদের খুব তৈলাক্ত ত্বক সে পুরুষ হোক বা মহিলা, বয়ঃসন্ধিক্ষণে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে যে হরমোনাল পরিবর্তন আসে, তাঁদের মধ্যে তার প্রভাব দেখা যায়। এর থেকে মুক্তি পাবার জন্য সবাই চেষ্টা করতে কসুর করেন না। বাজার চলতি ওষুধ বা টোটকার সাহায্য পর্যন্ত নিয়ে থাকে। আর নিজের ওপর এক্সপেরিমেন্ট করতে থাকেন। এতে হিতে বিপরীত প্রতিক্রিয়াই বেশি দেখা যায়। ত্বককে আরও বেশি করে খারাপ করে দেয়। আমি বলব, নিজেকে নিয়ে গবেষণা করবেন না। একজন ভালো চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ বা ত্বকের জন্য যিনি চিকিৎসক, তাঁর সাহায্য নিন। তিনি আপনাকে সঠিক রাস্তা দেখিয়ে দিয়ে আপনার সমস্যার সমাধান করবেন। মনে রাখবেন, ত্বকের যে কোনো সমস্যার সমাধান চট জলদি হয় না। ধৈর্য ধরে, চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে চলে, ওষুধ নিয়মিত ও নিয়ম অনুসারে খেয়ে নিজেকে সুস্থ করে তুলতে হবে। যদি আপনি মনে করেন যে সেরে গেছে, আর বন্ধ করে দিলেন ওষুধ। তাহলে ক্ষতি আপনার হবে। আরও কারোর নয়। এই শীতের সময়ে খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রিত রাখতে হবে। এই সময়ে একেবারে সাদামাটা খাবার খেলে শরীরে কোনো অসুবিধা হবে না। আর সব থেকে ভালো বিষয় হচ্ছে সাদামাটা খেলে আমাদের পেটের ওপর চাপটাও খুব কম পড়ে। পেট ভালো থাকলে আমাদের ত্বকও ভালো থাকবে এটা মাথায় রাখবেন।

আর একটি সমস্যা, যেটা শীতের সময়ে বেশি হয়। আর বেশ অস্বস্তিদায়ক। সেটা হলো চুলের ক্ষেত্রে খুসকির সমস্যা। এটা মাথার চামড়ার সমস্যা। এই সমস্যার প্রকোপ সাধারণত নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দেখা যায়। এটা আমরা অনেক সময় শ্যাম্পু ব্যবহার করে সাময়িক ভাবে দূর করে থাকি। মাথার ওপরের ত্বক বা চামড়াটা শুকিয়ে যায় ও রুক্ষ এবং শুষ্ক হয়ে যায়। এর জন্য আপনি নিয়মিত শ্যাম্পু যেমন করবেন, তেমনি চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে লোশন ব্যবহার করবেন। অন্তত এই সময়টায়। প্রায় একই রকম সোরিয়াসিস। তবে এটা পুরোপুরি চিকিৎসকের নির্দেশ মেনে চলতে হবে। নিজে নিজে কিছু করার চেষ্টা না করাই ভালো। আর এই রোগটি আপনাকে চিহ্নিত করে দেবে একমাত্র চিকিৎসকই। এর লক্ষণ শুধু মাথায় নয়, শরীরের যে কোনো অংশে, যেমন পিঠে, ঘাড়ে, বুক সমেত নানা জায়গায় দেখা যায়।

সব শেষে এই শীতের সময় মেকআপ করার সময় যে বিষয়টা খুব খেয়াল রাখবেন সেটা বলি। আমরা মেকআপ করার সময় লিপস্টিক সমেত নানা জিনিস ব্যবহার করে থাকি। যদি দেখা যায় এটা বেশিক্ষণ থাকার পর ত্বকের অস্বস্তি হচ্ছে, তাহলে তৎক্ষণাৎ সেই মেকআপ তুলে ফেলাই উচিত। আর চিকিৎসকের সামান্য পরামর্শ মেনে, কী ধরনের মেকআপ ব্যবহার করলে এই ধরনের সমস্যা দেখা দেবে না, সেই বিষয়ে জেনে নিলে উপকার আপনারই হবে। আবার মনে রাখবেন, আপনার ত্বক হচ্ছে আপনার সৌন্দর্যকে আরও সুন্দর করে তোলার একটা মাধ্যম। আর এই মাধ্যমটি খুব সংবেদনশীল। তাই একে চটিয়ে বা আঘাত করে কিছু না করাই শ্রেয়।

(অনুলিখন : স্বপন দাস)

শরীরের গরমই পারে শীতকালের সমস্যা থেকে রক্ষা করতে

(শীতকালে নিজেকে সাধারণভাবে কী করে সুস্থ রাখবেন, তাই নিয়ে বলেছেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ অরিন্দম বিশ্বাস)

অন্য সব ঋতুর থেকে শীতকাল একটু আলাদা। এই শীতের সময় আমাদের একটু সাবধানতা দরকার। সে ছোটোই হোক আর বড়ো। সবার ক্ষেত্রেই এই সাবধানতা দরকার। কেননা এই সময় এমন অনেক সমস্যার সৃষ্টি হয়, যেটা থেকে পরিস্থিতি জটিল হতে পারে। বড়োরা অনেক সময় এই শীতকালে ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হতে পারেন। যে কোনো সময় তাঁদের সর্দি-কাশি হতে পারে। আর তা থেকেই নিউমোনিয়া দেখা দিতে পারে। এই সময়ে আমাদের সাবধানতা দরকার। যখনই ঋতু পরিবর্তন হয়। অর্থাৎ গরম থেকে শীত আসে, সেই সময় গরম জামা পরতে একটু হলেও সময় নিয়ে নিই। আর এর থেকে হতে পারে সর্দি কাশি। এর হাত থেকে বাঁচতে আমাদের শীতের শুরু থেকেই বিভিন্ন ভাবে, বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন স্তরে জামা কাপড় পরতে হবে। একটা উদাহরণ দিই। শীতের শুরুতে মোটা সোয়েটার পরার থেকে একটি শার্টের তলায় আরেকটি শার্ট বা একটি গেঞ্জি পরতে হবে। এই ভিতরের লেয়ারটা বাড়াতে হবে। পরে শীত যেরকম বাড়বে, সেই রকম গরম জামা কাপড় পরা বাড়াতে হবে। তাতে কি হবে, আমাদের শরীরের গরম হাওয়াটা, শরীরের ভিতরে রয়ে যাবে। স্বাভাবিক ভাবে আমাদের শরীরের গরমটা তৈরি হবে। শীতের সময় আমরাও অনেকটাই নিজেদেরকে নানা সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করতে পারব।

শরীরের যত গরম কিন্তু কান থেকে বেরোয়। এই কান দিয়েই কিন্তু শীতের ঠাণ্ডা হাওয়া ঢোকে শরীরে। তাই বলা হয়, কানটা ঢাকতে। কান ঢাকলে আমাদের শরীরের তাপমাত্রা অনেক সময় নিয়ন্ত্রিত হয়। আর ওই সর্দি কাশির হাত থেকে নিজেদের বাঁচাতে পারি। শীতকালে আমাদের শরীর শুষ্ক হতে থাকে। আমরা ঠিক মতো জল খাই না। ফলে নানা রকম সমস্যা দেখা দেয়। সেই সমস্যা থেকে বাঁচতে আমাদের পর্যাপ্ত পরিমাণে জল খেতে হবে।

এই শীতের সময় সকলেই একটু গরম খাবার, মশলাদার খাবার বেশি খেয়ে ফেলি। মনে রাখতে হবে, আমাদের হজম ক্ষমতা সবার এক নয়। তাই সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। আমরা এই শীতের সময় সারা বছর যেভাবে, খাদ্যাভাস নিয়ে চলি, সে ভাবেই চলব। আমাদের হজম যন্ত্রের ওপর বেশি চাপ দেব না। চাপ দিলে সেটা কিন্তু ঠিক মতো কাজ করবে না। দেখা দেবে নানা সমস্যা। নিয়ন্ত্রিত আহার জরুরি এই সময়ে। যারা একটু এয়ার কন্ডিশনড পরিবেশে কাজ করেন বা ঘরে থাকতে পছন্দ করেন, তাঁদের জন্য বলব যতটা পারেন, বাড়িতে এসি বন্ধ রাখার চেষ্টা করবেন, আর অফিসে গায়ে চাদর বা গরম জামা কাপড় পরে নেবেন।

একটি কথা মনে করিয়ে দিই, যারা নিয়মিত নানা ওষুধ খান তাঁরা যেন এই সময়ে সেটা কোনো মতেই বন্ধ না করেন। তাতে ক্ষতি হবে আপনারাই। অনেকে শরীর সুস্থ রাখতে সকালে হাঁটেন। এই শীতকালে আমি বলব, খুব সকালে হাঁটতে বেরোবেন না। একটু বেলায়, পরিবেশ একটু গরম হলে হাঁটতে বেরোন। পারলে বিকেলে হাঁটুন। ক্ষতি কিছু হবে না। আর একটি কথা বলি, বাইরে বেরোতে হবে না, বাড়ির ভিতরে হাঁটুন। কাজ একই হবে। শীতকালে বাড়িতে জুবুথুবু হয়ে বসে থাকবেন না। শরীরকে একটু চালু রাখবেন এই সময়। তাতে শরীরের সমস্যা অনেকটাই হবে না। বিশেষ করে হাড়ের। বসে থাকলে আমাদের হাড়ের ক্ষয়ের একটা সমস্যা তৈরি হতে পারে। আর শরীরকে চালু রাখলে সেটা হবে না। তাই বসে থাকা উচিত নয়। বাড়ির ভিতরে একটু হাঁটুন।

নিয়মিত যারা নানা ওষুধ খান, নানা শরীরগত সমস্যার জন্য, তাঁদের ওষুধ খেয়ে যেতে বলি। কারণ যাদের হাঁপানি বা অন্য ক্রনিক কোনো রোগ আছে এই সময়ে বাড়াবাড়ি হয়। সেদিকটাও মনে রাখতে হবে। ওষুধ নিলে এই সমস্যা থেকে অনেকটাই নিজেকে রক্ষা করতে পারবেন। আর যাদের এলার্জি আছে তাঁদের বলি খুব সাবধানে থাকবেন এই সময়। এই সময়ে ধুলো বালি থেকে এলার্জি হতে পারে। তাই সেটা থেকেও নিজেকে রক্ষা করবেন।

অনুলিখন : স্বপন দাস

শীতকালে প্রচুর পরিমাণে লেবু আর আমলকি খেতে হবে

শীতকালে বাতের যন্ত্রণা, শ্লেষ্মাধিক্য থেকে উপশমের উপায় বলছেন আয়ুর্বেদ চিকিৎসক ডাঃ দেবাশিস পাহাড়ি, মুখ্য গবেষক, শ্রী বৈদ্যনাথ আয়ুর্বেদ ভবন।

বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণে আমরা শীতকালকে ভুলতেই বসেছি। এখন আমাদের কাছে শীত সামান্য সময়ের অতিথি হলেও, আদরের। আর আদরের হলেও এই সময়ে আমরা মাঝে মাঝেই অসুস্থ হয়ে পড়ি নানা কারণে। আর সেইসব বিষয় থেকে নিজেকে বাঁচাতে চিকিৎসকের কাছে দৌড়তে হয়। এই সময়ে কিছু ক্রনিক, বংশগত

রোগ ছাড়াও এমন অনেক রোগ আছে, যেগুলি দীর্ঘদিন ধরে আমাদের শরীরে রয়েছে, সেগুলির প্রকোপ বেড়ে যেতে দেখা যায়। উদাহরণ হিসেবে, ব্রঙ্কিওল অ্যাজমার নাম বলতে পারি। বাত ও হাঁপানি রোগ এই শীতকালে বাড়তে দেখা যায়। এছাড়াও কিছু কিছু চর্মরোগও এই সময়ে দেখা যায়। মনে রাখতে হবে, শীতকালে বেশি হয় বলে যে শুধু শীতকালেই এর জন্য আমরা প্রতিরোধ গড়ে তুলব, তা কিন্তু হবে না। আমাদের দরকার পড়লে সারা বছর ধরে এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলব। সেইমত চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ যেমন খাব, তেমনি জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে একটু নিয়ম মেনে চলব এই শীতকালে।

আমাদের আয়ুর্বেদে রসায়ন সেবনের কথা বলা আছে। কী এই রসায়ন সেবন? এই রসায়ন সেবন সারা বছর ধরে যেমন করা যেতে পারে, আবার শীতের সময় একটু বেশি করে করা যেতে পারে। লেবু জাতীয় ফল আমরা সারা বছর ধরে আমাদের খাদ্য তালিকায় রাখতে পারি। আর রাখতে পারি আমলকি। রসায়ন হিসেবে আমরা এটাকে সেরা রোগ প্রতিরোধক হিসেবে বলে থাকি। সারা বছর ধরে অনেকেই এই দুই রসায়ন গ্রহণ করে থাকেন। আমরা অনেকেই বলে থাকি যে শীতের সময় চ্যবনপ্রাশ খাবেন। কেন বলে থাকি? কারণ এই চ্যবনপ্রাশের মূল উপাদানই হলো আমলকি। ফলে বুঝতেই পারা যাচ্ছে আমলকির গুরুত্ব কতটা। হরিদ্রা, বিশেষ করে কাঁচা হরিদ্রা, এটি অ্যান্টি অ্যালার্জিক। ত্বকের কোনো সমস্যায় এটি ভালো কাজ করে থাকে। অনেকে সারা বছর এর ব্যবহার করে। শীতের সময় কাঁচা হলুদ যেমন গায়ে মাথা যায়, তেমনি খাওয়াও যায়। এই প্রসঙ্গে আদার কথাও বলা যায়। শীতকালে শ্লেষ্মার সংক্রমণ থেকে বাঁচায় এগুলি। যাদের বাত আছে, এই শীতকালে ব্যথা বাড়ে। আবার তাদের কফের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। সকালে উষ্ণ গরম জলে এক টুকরো আদা দিয়ে খেলে অনেকটা উপশম হতে পারে আয়ুর্বেদে বলা আছে। এছাড়া যারা বাতের নানা সমস্যায় ভুগছেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে বলব, আয়ুর্বেদে খুব ভালো ওষুধ ও তেল পাওয়া যায়। চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে, সেগুলি ব্যবহার করলে এই ব্যথা বা অন্যান্য সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পারেন। ■

ফঃ ৪

প্রচণ্ড শীতে সুস্থ থাকার সহজ উপায়

ডাঃ নূপুর বিশ্বাস

আয়ুর্বেদের মতে স্বাস্থ্যকর জীবনের তিনটি মন্ত্র হলো সঠিক আহার, পরিমিত নিদ্রা, স্বাস্থ্যকর আচরণ। প্রাচীনকাল থেকেই জীবনধারণ, খাদ্যগ্রহণ ও সুস্থ জীবনশৈলী নিয়ে নানা চর্চা হয়েছে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে। ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য ও বিশ্রামের অভ্যাস

একে অপরে সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে সেকথা বারবার উল্লেখ রয়েছে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে।

শীত না পড়লেও ঠাণ্ডা হিমেল হাওয়া জানান দিচ্ছে হেমন্ত পেরিয়ে শীত আসন্ন। এই সময় নানান সংক্রমণে হজমের সমস্যা-সহ একাধিক সমস্যার সম্মুখীন হয়। আয়ুর্বেদশাস্ত্রে ঋতুচর্যা বর্ণনা করতে গিয়ে ছয় ঋতুকে উত্তরায়ণ বা আদানকাল আর দক্ষিণায়ণ বা বিসর্গকালে এভাবে ভাগ করা হয়েছে। এই ছয় ঋতু হলো শিশির (শীতকাল), বসন্ত, গ্রীষ্ম (গরমকাল), বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত। আয়ুর্বেদের মতে প্রতিটি ঋতুর একটি আলাদা প্রভাব রয়েছে। প্রতিটি ঋতুতে নানান রোগের সম্ভাবনা রয়েছে, তাই নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে খাবার গ্রহণ করা উচিত।

খাদ্যাভাসে পরিবর্তন আনুন : আয়ুর্বেদের মতে খাদ্যরসকে ছয়টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সেগুলো হলো মধুর, অম্ল, লবণ, কটু, তিক্ত, কষায়। বিভিন্ন ঋতুতে এই ছয়টি রসযুক্ত খাবার পর্যাপ্ত পরিমাণে গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে। শিশির ঋতুতে শরীরে কফ সঞ্চয় হয়, শরীরে রুক্ষতা উৎপন্ন হয়, বিভিন্ন বাত বিকার উৎপন্ন হয়। এগুলো থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ব্যালেন্স ডায়েটের সঙ্গে সঙ্গে মধুর, অম্ল, লবণযুক্ত খাদ্যগ্রহণের দিকে বেশি নজর দিতে হবে। এখানে অম্ল বলতে ভিটামিন সি-যুক্ত খাবার খাওয়ার কথা বলা হয়েছে। যেমন আমলকি, কমলালেবু, আপেল, পেয়ারা, ইত্যাদি। ভিটামিন সি-যুক্ত খাবার রোগ প্রতিরোধের সঙ্গে সঙ্গে নানান সংক্রমণের হাত থেকে শরীরকে রক্ষা করে। এই সময় পর্যাপ্ত শীতকালীন ফল আর শাকসবজি গ্রহণ করতে হবে। যেমন গাজর, বিট, মুলো, বাঁধাকপি, ফুলকপি, পালংশাক ইত্যাদি। আদা, রসুন ও হরিতকি সেবন করতে হবে। গমের আটা অথবা ছোলা থেকে বানানো খাবার গ্রহণ করা যেতে পারে। আনুপ মাংস গ্রহণ করতে হবে। এখানে আনুপ বলতে বোঝানো হয়েছে যে প্রাণী জলাশয়ে বাস করে, মানে মাছ খেতে বলা হয়েছে। বেশিক্ষণ খালি পেটে থাকবেন না। নির্দিষ্ট সময়ে খাবার খেয়ে নিন। রাতে কম খাবার খান। রাতে ঘুমাতে যাওয়ার তিন ঘণ্টা গাগে রাতের খাবার গ্রহণ করা উচিত। ঘুমোনোর দু-তিন ঘণ্টা আগে হলুদ মিশিয়ে এক গ্লাস গরম দুধ পান করতে পারেন। ঈষদুষ্ণ জল পান করতে হবে।

বিশ্রাম : পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিতে হবে। এই সময় দিন ছোটো, রাত্রি বড়ো হয়। তাই সমস্ত বিষয়ের সঙ্গে আপনাকে মানিয়ে নিতে হবে। সকালে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠতে হবে আর রাত্রিতে তাড়াতাড়ি ঘুমাতে যেতে হবে।

শরীরচর্চা করুন : নিয়মিত শরীরচর্চা যোগব্যায়াম করতে হবে যা আপনার শরীরকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করবে যেমন প্রাণায়াম, কপালভাতি, পদ্মাসন, যোগাসন ইত্যাদি।

বিহার : পুরো শরীরে তেল মালিশ করতে হবে। মাথায় তেল লাগাতে হবে। ধূপ সেবন (সূর্যের আলো) গ্রহণ করতে হবে। ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করতে হবে। পর্যাপ্ত গরম বস্ত্র পরিধান করতে হবে। এই সময় উষ্ণ গৃহে বসবাস করার বিধান আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে উল্লেখ করা আছে।

কী করবেন না : লঘু আহার, বায়ু প্রকোপক আহার-বিহার ত্যাগ করতে হবে। এই সময় ঠাণ্ডা খাবার মানে কোলড্রিংকস, আইসক্রিম, ফ্রিজে রাখার ঠাণ্ডা জল, দই ইত্যাদি খাবার থেকে বিরত থাকতে হবে। তাছাড়া বাসি খাবার গ্রহণ করা চলবে না। ছাতু ঠাণ্ডা জলে মিশিয়ে খাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। অতিরিক্ত পরিমাণে মশলা, তেল বা ফ্যাট জাতীয় খাবার গ্রহণ করা যাবে না।

এভাবে চললে শীতকাল পুরোপুরি উপভোগ করতে পারবেন। ■

শীতকালে দাঁতের সমস্যা এড়ানোর সহজ কয়েকটি উপায়

শীতকালে দাঁত নিয়ে অল্প বিস্তর সমস্যায় পড়তে হয় সবাইকেই। তার থেকে নিস্তার পাবার উপায় জানাচ্ছেন বিশিষ্ট দন্তরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ দীপ্তশঙ্খ চক্রবর্তী।

যখন ঋতু পরিবর্তন হয়, আবহাওয়ায় তাপমাত্রার একটা পরিবর্তন আসে। সেই তাপমাত্রার ওঠা-নামা আমাদের অনেকের দাঁত নিতেই পারে না। কেননা শরীরের অন্যান্য অংশ বা অঙ্গের থেকে দাঁত অনেক বেশি সংবেদনশীল। এই শীতকালে দেখা গেছে অনেকের দাঁতের আগে সমস্যা না থাকলেও নতুন করে সমস্যা দেখা দিয়েছে।

শীতকালে দেখা যায়, দাঁত কনকন করছে, ঠাণ্ডা খাবার বা পানীয় খেলে দাঁতে একটা শিরশিরানি মতো হচ্ছে। যার কারণে শরীরে একটা অস্বস্তি যেমন দেখা দিচ্ছে, তেমনি খেতে অসুবিধা হচ্ছে। এর জন্য দায়ী হচ্ছে দাঁতের এনামেলের ক্ষয়, যাকে আমরা বলি 'হাইপোমিনারালাইজেশন'। এই অবস্থা হলে ঠাণ্ডা বাতাস বা অন্য ঠাণ্ডা কিছুর স্পর্শে দাঁতের সংবেদনশীল অংশে একটা সমস্যা বাড়তে দেখা যায়। দাঁত শিরশির করতে থাকে। আবার এটাও দেখা যায় যে দাঁতে সুঁচ ফোঁটানোর মতো দপ দপ করে ব্যথা হচ্ছে। আসলে এর পিছনে দাঁতের মধ্যে থাকা স্নায়ু। যা কিনা আলাদা আলাদা ভাবে প্রতিটি দাঁতে থাকে। আর সেই কারণেই সব দাঁতে না হলেও কিছু কিছু দাঁতে এই ধরনের সমস্যা দেখা যায়।

শীতকালে মাড়িতে নানা রকমের সংক্রমণ দেখা যায়। এর কারণ হচ্ছে আমাদের মুখের ভিতরে শুষ্ক হয়ে যাওয়া। যাকে আমরা ড্রাই মাউথ বলে থাকি। এটি আরও বেশি করে দেখা যায় যারা ডায়াবেটিসে আক্রান্ত, তাঁদের মধ্যে। এটি হয় শীতকালে আর্দ্রতা বেড়ে যাওয়ার কারণে, লালারস শুকিয়ে যাওয়ার ফলে। মুখের ভিতরে নানা সংক্রমণও দেখা যায় এই কারণে। দাঁতের মাড়ি সমেত দাঁতেও নানা সংক্রমণ হয় এই সময়ে।

শীতকালে দাঁতের সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে আমরা কয়েকটি সাধারণ বিষয়কে মেনে চলে পারি। যেমন দাঁত মাজার জন্য শক্ত ব্রাশের বদলে নরম ব্রাশ ব্যবহার করতে পারি। টুথপেস্ট করার করার সময় চিকিৎসকের পরামর্শ মতো সংবেদনশীল দাঁতের জন্য তৈরি বিশেষ যে টুথপেস্ট পাওয়া যায়, সেগুলো ব্যবহার কাকর চেষ্টা করব আমরা। আর অবশ্যই যারা দাঁত নিয়ে সমস্যায় ভুগি, তাঁরা এই বিষয়টাকে মেনে চলার চেষ্টা করব। দাঁত কিন্তু কখনই জোরে, চেপে মাজব না। কেননা জোরে চেপে মাজলে মাড়ি ও দাঁতের এনামেলের ক্ষতি হতে পারে। প্রতিটা দাঁত আলাদা ভাবে, ওপর নীচ করে মাজার চেষ্টা করবেন, তাতে মাড়ি ও দাঁত ক্ষতি হবে কম। একেবারেই দাঁত খোঁচাখুঁচি করবেন না। আর দাঁতের সমস্যা দেখা যায় যে সব খাবার খেলে, সেগুলি থেকে একটু দূরে থাকতে হবে এই সময়। শীতকালে নাক দিয়ে শ্বাস নিয়ে মুখ দিয়ে ছাড়ুন। দেখবেন বেশ আরাম পাচ্ছেন।

শীতকালে মুখের ভিতরে জীবাণু ঘটিত সংক্রমণ এড়াতে মাস্ক ব্যবহার করুন। শরীর গরম থাকলে দাঁতের সংক্রমণ থেকে সাময়িক ভাবে রেহাই পাওয়া যেতে পারে। তাই শীতে রোদে বসে, শরীরে রোদ লাগাতে পারেন। তবে দুপুরের চড়া রোদে একেবারেই নয়। মনে রাখবেন, চিনি দাঁতের ক্ষেত্রে খুব একটা সুখকর নয়। বিশেষত যাদের দাঁতের সমস্যা আছে। তাই শীতে এই চিনি এড়িয়ে চলবেন।

ছটপূজায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উদ্যোগে সেবা শিবির

ছটপূজা উপলক্ষ্যে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ পশ্চিম কলকাতার উদ্যোগে মালাপাড়া মোড়ে এক সেবা শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরের উদ্বোধন করে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পশ্চিম কলকাতার উপদেষ্টা মহাবীর বজাজ বলেন, হিন্দু সংস্কৃতিতে মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রকৃতির প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়। এজন্য প্রকৃতির সবকিছুর পূজা করা হয়। আমরা কেবলমাত্র সূর্য ভগবানকেই প্রত্যক্ষরূপে দর্শন করে থাকি। এজন্য ছটব্রতীরা সূর্যদেবকে অর্ঘ্যদান করে তাঁর পূজা করেন।

সেবা শিবিরে ছটব্রতীদের শরবত পানের ব্যবস্থা করা হয়। চার হাজার ছটব্রতী শরবত পান করেন। পৌরমাতা শ্রীমতী মীনাদেবী পুরোহিত একদিন শিবিরে উপস্থিত হয়ে ছটব্রতীদের শুভকামনা জানান এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সেবাকাজের প্রশংসা করেন।

সেবা শিবিরে সক্রিয় সহযোগিতা করেন রামগোপাল সুঙ্গা, ডাঃ বিজয় হরভজনকা, শশি নারসরিয়া, সুরজ প্রসাদ গুপ্তা, ব্রহ্মানন্দ বংগ, হরিশঙ্কর মৌরিজাওয়ালা, যশবন্ত বালাসিয়া, কালুরাম আগরওয়াল, অশোক কুমার সিংহানিয়া, প্রবীণ শর্মা, উষা পাণ্ডে, শৈলেশ কুলথিয়া, মুলতানমল পারীক, নওরতন ঝাঁওয়ার, অশোক কুমার দুবে, অশোক কুমার শর্মা, উষা বাঘেলা, রামাশিস রায়, সত্যনারায়ণ মৌরিজওয়ালা, রামেশ্বর শর্মা, সজ্জন সিংঘল, রূপকিশোর কুলথিয়া, গণেশ ঝা প্রমুখ।

ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের উদ্যোগে গোপাষ্টমীতে গোমাতা পূজন

গত ২০ নভেম্বর গোপাষ্টমীর পুণ্যতিথিতে ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের উদ্যোগে রাজ্যজুড়ে পালিত হলো গোমাতা পূজন। এদিন গোমাতাদের স্নান করিয়ে মাথায় সিঁদুর দিয়ে এবং শিঙে তেল মাখিয়ে, গলায় মালা পরিয়ে নৈবেদ্য-সহ পূজা করা হয়। পূজার পর গোমাতাদের প্রদক্ষিণ করে তাদের পছন্দের খাবার খাওয়ানো হয়।

ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের পালনীয় চারটি দিনের মধ্যে একটি হলো গোমাতা পূজন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গোমাতার পূজাকে স্মরণ করে গোপাষ্টমীতে ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘ গোমাতা পূজন করে থাকে। এদিনের কর্মসূচি সম্পর্কে ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের পশ্চিমবঙ্গ প্রান্তের সভাপতি তথা অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর সদস্য কল্যাণ কুমার মণ্ডল বলেন, হিন্দুদের কাছে গর্ভধারিণী মায়ের পরেই গোমাতার স্থান। মায়ের দুধ পান করেই আমরা বড়ো হয়েছি। ভারতীয় দেশি জাতের গাভীর দুধ অত্যন্ত পুষ্টিকর। কৃষকদের দেশি গোরু পালনের ওপর জোর দিতে হবে। মানুষকে গোপালনে উৎসাহিত করতে হবে।

দক্ষিণ মুর্শিদাবাদ প্রচার বিভাগের উদ্যোগে পুস্তক বিপণন কেন্দ্র

গত ১৪ নভেম্বর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণ মুর্শিদাবাদ জেলার প্রচার বিভাগের উদ্যোগে গোরাবাজার মোহনের মোড়ে এক পুস্তক বিপণন কেন্দ্রের আয়োজন করা হয়। প্রদীপ প্রজ্বলন করে বিপণন কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন বহরমপুর নগরের প্রবীণ স্বয়ংসেবক প্রভাস কুণ্ডু।

With Best Compliments from -
A
Well Wisher

সন্তকথা

দুর্গাপ্রসন্ন পরমহংসদেব

কল্যাণ গৌতম

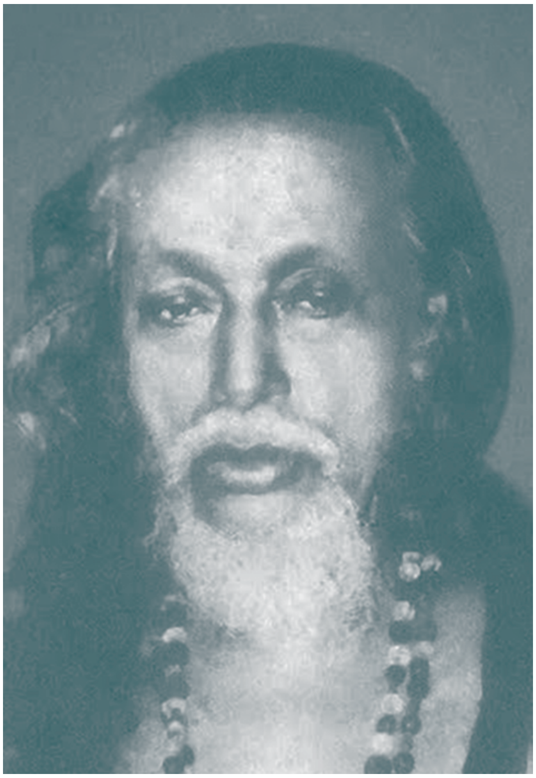

আজ থেকে প্রায় ১৩০ বছর আগে পরিব্রাজকাচার্য শ্রীমদ দুর্গাপ্রসন্ন পরমহংসদেব এক মহারাস পূর্ণিমায় বরিশালের রাজাপুর গ্রামে আবির্ভূত হলেন। পিতা উমাচরণ চক্রবর্তী, মা চিন্তামণি দেবী। সাত ভাই-বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন পিতা-মাতার তৃতীয় সন্তান, দ্বিতীয় পুত্র। তাঁর পিতামহ মদননারায়ণ চক্রবর্তী। মাতামহ ভগবানচন্দ্র চক্রবর্তী। গুরুদেবের প্রথম দীক্ষাগুরু তথা উপনয়নের আচার্য ছিলেন নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য। দশ বছর বয়সে তাঁর উপনয়ন সংস্কার সাধিত হয়। তাঁর গুরুদেব ছিলেন পরমারাধ্য শ্রীশ্রী নিগমানন্দজী।

১৯১৬ সালের মহাষ্টমীর দিন নিজের জন্মস্থানে এক মহাযজ্ঞ সুসম্পন্ন করেছিলেন তিনি। পরের বছরে ১৯১৭ সালে অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে তিনি গুরুসাধনায় সিদ্ধিলাভ করলেন। সে বছরই চৈতি অমাবস্যায় সিদ্ধিলাভ হলো শক্তিসাধনায়। তিনি সন্ন্যাসলাভ করেছিলেন ১৯২২ সালে, অর্থাৎ আজ থেকে একশো বছর আগে। পিতার পুণ্যস্মৃতিতে তাঁর ভ্রাতা-ভগিনীরা মিলিত হয়ে যে উমাচরণ পুস্তকাগার স্থাপন করেছিলেন পূর্ববঙ্গে, তা দিয়েই তাঁর শিক্ষাবিস্তারের ভাব-অনুভবের ইচ্ছে ছড়িয়েছিল।

কলকাতায় শ্রীগুরু সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৪৫ সালে। এর দশবছর পর তিনি পেলেন আধ্যাত্মিক জগতের পরম বৈভবশালী উপাধি 'পরমহংস'। তাই তাঁর পূতপবিত্র নামের সঙ্গে আমরা পরমহংসদেব কথাটি যোগ করে থাকি। ভারত ভাগ হবার পর ১৯৫০ সালে নদীয়ার মাঝিপাড়া-পলাশীতে প্রতিষ্ঠা করলেন বিখ্যাত 'গিরিধারী আশ্রম'। সেখানেই পরে উমাচরণ পাঠাগার স্থানান্তরিত হলো। ক্রমে ক্রমে এই কর্মযোগী সন্ন্যাসী তৈরি করলেন কলকাতার নাকতলায় কেন্দ্রীয় আশ্রম, গোপীনাথের মন্দির, সাধনগুহা। প্রতিষ্ঠা করতে দেখা গেল 'আশুতোষ শিবমন্দির, পঞ্চমুণ্ডীর আসন, বিষ্ণুযজ্ঞ উদ্‌যাপন করার জন্য শ্রীশ্রী নিগমানন্দ তপোবন।

বালক-বালিকাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে তাঁকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে দেখা যায়। পলাশীতে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করলেন যথাক্রমে ১৯৫৮ ও ১৯৬২ সালে। ১০৬০ সালে বর্ধমানের নীলপুরেও স্থাপিত হলো আচার্য দুর্গাপ্রসন্ন বিদ্যামন্দির। আশ্রমের শাখা স্থাপিত হয়েছিল বর্ধমানে, ভুবনেশ্বরে, কাশীতে, বৃন্দাবনে ও নবদ্বীপে। তিনি প্রভূত ভক্ত সম্মেলনের আয়োজনে ছিলেন মধ্যমণি, মণিমাণিক্য। ভক্তমণ্ডলী তাঁর অশেষ কৃপা পেয়েছেন সর্বদা। তাঁর আবির্ভাব মহোৎসব শুরু হয়েছিল তাঁরই জীবৎকালে। দীক্ষা দান করে ধন্য করেছিলেন অসংখ্য মানুষকে। মনুষ্যেতর প্রাণী ও উদ্ভিদও তাঁর পরম কৃপা থেকে বঞ্চিত হয়নি। ১৯৭৫ সালের এক শ্রাবণ শুক্লা দশমী তিথিতে কলকাতায় কেন্দ্রীয় আশ্রমে তিনি ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করেন।

ঠাকুর পার্থিব শরীরে যে উপদেশ দিয়ে গেছেন, সেটাই হলো 'মধুকথা'। মধুকথা হলো ঠাকুরের আশীর্বচন। তিনি জীবনের চারটি কর্ম নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন যাকে বলা হয় কর্মচতুর্যয়; সঙ্ঘের মূলমন্ত্র, নীতিবাক্য, আপ্তবাক্য। সত্য-সেবা-নীতি-ধর্ম। এই কর্মগুলি ধর্ম আধারিত; Karma based on Dharma, ধর্ম, যা আমাদের ধরে রাখে। পাশ্চাত্যে, মধ্যপ্রাচ্যের জন্য যে রিলিজিয়ন কথাটি প্রচলিত আছে, সনাতনী 'ধর্ম' কথাটি তার চাইতেও ব্যাপক। রিলিজিয়নকে ছাপিয়ে যায় ধর্মের অর্থ, গূঢ়ার্থ। শ্রীভগবতগীতার প্রথম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকটি মনে করা যেতে পারে। ধৃতরাষ্ট্র উবাচ—

'ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয়।।'

শ্লোকের প্রথম দুটি শব্দবন্ধতেই সম্ভবত গীতার মূল প্রতিপাদ্যটি লুকিয়ে আছে। কী আছে? বলা হয়েছে 'ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে'। 'ধর্ম' কথাটি আছে, 'কুরু' কথাটি আছে। আ দু'বার 'ক্ষেত্র' কথাটি আছে। যদি শব্দবন্ধদুটিকে সাজিয়ে নিই, তবে কী হবে? ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে ধর্ম কুরু। অর্থাৎ জীবনের সার্বিক ক্ষেত্রে ধর্ম অনুশীলন করে যেতে হবে। যাতে মানবসভ্যতাকে ধরে রাখতে পারি, শুভবোধ থেকে বিচ্যুত না হই।

জীবনের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে কী ধরে রাখবো? সত্য, সেবা, নীতি।

সত্যের কথায় আসি। ভগবানের প্রিয় হতে হলে সত্যাশ্রয়ী হতে হয়। সকলের মধ্যে সত্যের জ্যোতির্ময় দর্শন করতে হয়। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ঋত-সত্যকে জানবো, মানবো, অনুসরণ করবো, করাবো। সমাজজীবনে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবো। সত্য পথে থাকবো। সৎ মানুষের সঙ্গ করবো। জীবনের ব্রত হিসাবে সত্যকে গ্রহণ করবো। দ্বিতীয় সেবা। সেবাই পরম ধর্ম। 'আত্মনো মোক্ষর্থং জগদ্ধিতায় চ।' ঋকবেদের একটি শ্লোক। এর অর্থ হলো, মোক্ষ লাভের জন্য, জগতের হিতের জন্য, সকলের মঙ্গলের জন্য আমাদের সেবাকাজ করে যেতে হবে। তৃতীয় হচ্ছে 'নীতি'। আজকাল নীতির বালাই নেই। সুনীতি না থাকলে সমাজ বন্ধ্যা হয়ে পড়ে। নীতিহীন সমাজে নৈতিক আদর্শ পুনঃস্থাপন করাই আধ্যাত্মিক সাধনার গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। □

বিস্মৃতির অন্তরালে বঙ্গের নবজাগরণের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র

অক্ষয় কুমার দত্ত

অধ্যাপক (ড.) স্বাগত বসু

বাঙ্গলার নবজাগরণে অক্ষয় কুমার দত্তের নামটা অতি অবশ্যই অক্ষয় হয়ে থাকবে। ১৮২০ সালের ১৬ জুলাই বর্ধমান জেলার নবদ্বীপের কাছে চুপি গ্রামে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতা পীতাম্বর দত্ত ছিলেন একজন সাব ইন্সপেক্টর। মাতার নাম ছিল দয়াময়ী দেবী। পিতার আকস্মিক মৃত্যুতে অক্ষয় কুমার দত্তকে সংসারের প্রয়োজনে খুব অল্প বয়সেই স্কুল শিক্ষা ত্যাগ করে কর্মজীবন শুরু করতে হয়। তিনি ভূগোল, পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, বাংলা, ইংরেজি, সংস্কৃত, ফার্সি ও জার্মান ইত্যাদি ভাষায় বিভিন্ন বিষয়ের ওপর পড়াশোনা করেন। তার মধ্যে বাংলা, ইংরেজি, সংস্কৃত, ফার্সি ও জার্মানে যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করেন। তিনি সংবাদ প্রভাকর পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা এবং সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তর সংস্পর্শে আসেন। পরবর্তীকালে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের পরামর্শে 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখতে থাকেন। পরে ১৮৩৯ সালে 'তত্ত্ববোধিনী সভা' প্রতিষ্ঠার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সেখানকার সভ্য হন এবং মাস খানেকের মধ্যেই সহকারী সম্পাদক হন। যদিও এই পত্রিকা ব্রাহ্ম মত প্রচারের এবং সমাজ-সংস্কারের উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হয়েছিল তবুও সেখানে সাহিত্য ও অন্যান্য বিষয়ও থাকতো। বিভিন্ন বিষয়ের উপর তাঁর জ্ঞান ছিল এবং লেখা প্রকাশিত হতো।

তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা গঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেখানকার শিক্ষক হিসেবে যুক্ত হন। তিনি তত্ত্ববোধিনী পাঠশালায় ভূগোল ও পদার্থবিদ্যা পড়াতেন। কিন্তু সে সময় ওই দুটি বিষয়ে উপযুক্ত বই না থাকায় অক্ষয় কুমার ওই বিষয়গুলোর ওপর বই লেখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। সেই অভাব পূরণের জন্য তিনি নিজেই কলম ধরলেন এবং বাংলায় ভূগোল ও পদার্থবিদ্যার বই লিখলেন। ভূগোল ও পদার্থবিদ্যার উপর তাঁর লেখা বই দুটি প্রকাশিত হওয়ার পর শিক্ষার্থীদের কাছে তা অত্যন্ত সমাদৃত হয়। এই দুটি বই শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের জন্য যেমন প্রয়োজনীয় ছিল তেমনিই প্রয়োজনীয় ছিল এই দুটি বিষয়ে জ্ঞান আহরণের জন্য।

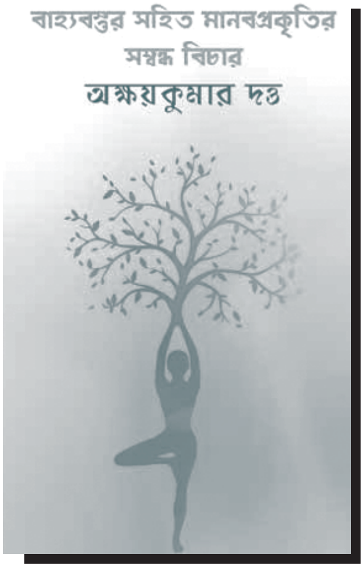

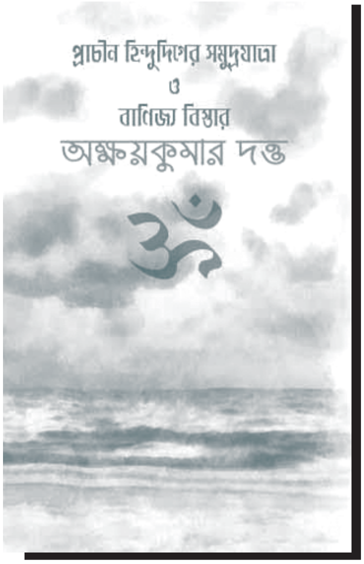

অক্ষয় কুমার দত্ত বিজ্ঞানমনস্ক ছিলেন। তিনি ছাত্রদের বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতেন। বিজ্ঞানের অগ্রগতির উদ্দেশ্যে তিনি অনেক অর্থ ব্যয় করেন। বাঙ্গলার জনমানসে বিজ্ঞানের আলো জ্বালাবার জন্য তিনি শ্রদ্ধেয় প্রসন্নকুমার ঘোষের সঙ্গে মিলিত ভাবে বিজ্ঞানভিত্তিক মাসিক পত্রিকা 'বিদ্যাদর্শন' প্রকাশ করেন। বিজ্ঞানে ইংরেজির অনেক পরিভাষা যা আজও বাংলায় ব্যবহার হয় সেটা তাঁরই সৃষ্টি। এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ অনুবীক্ষণ, দূরবীক্ষণ, কুমেরু, সুমেরু ইত্যাদি।

আজকাল বেশ কিছু বছর থেকে মাতৃভাষায় শিক্ষাগ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হচ্ছে। এ নিয়ে

অনেক বিতর্ক হয়েছে এবং হচ্ছে। বাঙ্গলার নবজাগরণের এই উজ্জ্বল নক্ষত্র অক্ষয় কুমার দত্ত ১৮৪৩ সালে ডেভিড হেয়ার স্মৃতি বক্তৃতায় মাতৃভাষায় শিক্ষা অর্জনের উপর জোর দেন এবং জাতীয় শিক্ষানীতি রূপায়ণের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। সেই সময়ে যে ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল তার পরিবর্তন চেয়ে তিনি আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার সপক্ষেও যুক্তি উপস্থাপনা করেন। তিনি শিক্ষাকে বয়সের ভিত্তিতে তিনটি শ্রেণীতে বা পর্বে ভাগ করেছিলেন। শিশু শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা এবং উচ্চ শিক্ষা। প্রথম শ্রেণী বা প্রথম পর্বের শিক্ষার শুরু দু' বছর থেকে এবং শেষ ছ' বছরে। এই পর্বের শিক্ষাদান হবে নির্দিষ্ট শিশুশিক্ষা কেন্দ্রেই। দ্বিতীয় পর্বের শিক্ষা ছ' সাত বছর থেকে চোদ্দ বা পনেরো বছর পর্যন্ত। এই শিক্ষাকে অক্ষয় কুমার দত্ত মাধ্যমিক শিক্ষা হিসেবে বর্ণনা করেছেন। পরবর্তী বা শেষ পর্বের শিক্ষাকে তিনি উচ্চশিক্ষা বলেছেন। এই পর্বের জন্য বয়স পনেরো-ষোলো থেকে কুড়ি-বাইশ বছর।

তিনি চেয়েছিলেন মেধাবী ছাত্ররা এই উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে শিক্ষাকে আরও উচ্চ স্তরে উন্নীত করবে। তিনি এটাও ভেবেছিলেন যে অর্থনৈতিকভাবে যারা শক্তিশালী তাঁরাও এই সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। অত্যন্ত আধুনিক মনস্ক শিক্ষাবিদ এবং সমাজ সংস্কারক ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে তাঁর প্রস্তাবিত শিক্ষা ব্যবস্থার অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

তিনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রভাবে ব্রাহ্ম মতে দীক্ষিত হয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে বিভিন্ন দর্শনের উপর পড়াশোনা করেন। ফরাসি দর্শন তাঁর উপর প্রবলভাবে প্রভাব ফেলে। তিনি হিন্দু ধর্মগ্রন্থ বেদের আত্মা এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কিত কিছু দর্শন যেটায় ব্রাহ্মরা বিশ্বাসী ছিলেন তার বিরুদ্ধাচারণ করেন। বেদকে ঈশ্বর সৃষ্ট বলেও তিনি মনে করতেন না। এর ফলে ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী হয়ে যায়। তিনি ব্রাহ্মসমাজ ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ত্যাগ করেন। অন্যদিকে ব্রাহ্মসমাজ থেকেও তাঁকে বহিষ্কার করা হয়। আসলে অক্ষয় কুমার দত্ত বিশ্বাস করতেন সমস্ত কিছুকে অভিজ্ঞতার নিরিখে বিচার করতে হবে। বিজ্ঞানকে চিনতে হবে, বুঝতে হবে পরীক্ষার মধ্য দিয়ে। তিনি ইংরেজ দার্শনিক ফ্রান্সিস বেকনের অভিজ্ঞতাবাদে বিশ্বাস করতেন। তবে তাঁর মতবাদ বা বিশ্বাস বারে বারেই সময়ের সঙ্গে পরিবর্তন হয়েছে যার ফলে অনেকে তাঁর যুক্তিবাদী চিন্তাধারার উপর আস্থা রাখতে পারেনি। তিনি সব সময়েই কুসংস্কারের বিরোধী ছিলেন।

তিনি তাঁর অকৃত্রিম বন্ধু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের সমাজ সংস্কারের কাজেও যুক্ত থাকতেন। তাই ১৮৫৬ সালে কাশীপুরে বিধবাবিবাহ প্রচলন এবং বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ইত্যাদি বন্ধ করার জন্য 'সমাজোন্নতিবিধায়িনী সুহৃদসমিতি' নামে যে সামাজিক সংগঠন তৈরি হয় তার সম্পাদকের দায়িত্ব অক্ষয়কুমার দত্তকেই দেওয়া হয়।

তাঁর লেখা চারুপাঠ প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ এবং তৃতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়েছিল যথাক্রমে ১৮৫২, ১৮৫৪ ও ১৮৫৯ সালে। এই তিনটি বই প্রাইমারি শিক্ষার ক্ষেত্রে সেই সময় এক অতি মূল্যবান গ্রন্থ হিসেবে পরিগণিত হতো। তাঁর লেখা 'ভারতীয় উপাসক সম্প্রদায়' একটি উল্লেখযোগ্য বই। এই অমূল্য বইটিতে ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং তাদের উপাসনার বিভিন্ন পদ্ধতি নিয়ে খুব সূক্ষ্ম ভাবে তিনি বিশ্লেষণ করেছেন। প্রাচীন হিন্দুদের মধ্যে কীভাবে বৈদিক ধর্মের আগমন হলো এবং পরবর্তীতে কীভাবে তন্ত্রবিদ্যা ও পুরাণ হিন্দুধর্মের সঙ্গে যুক্ত হলো সে সম্বন্ধেও আলোচনা করা হয়েছে এই বইটিতে।

এই গবেষণামূলক বইটি লিখতে অনেক পরিশ্রম করে তথ্য সংগ্রহ করেন এই যুক্তিবাদী, সমাজ সংস্কারক লেখক। তাঁর গবেষণামূলক তাঁর লেখা কিছু বই তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়েছিল।

'প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্য বিস্তার' বইটি তাঁর মৃত্যুর পর বই আকারে প্রকাশ হয়। এই বইটিতে অতীতে ভারতীয়রা কীভাবে ব্যবসা বাণিজ্য করতো সেই সম্বন্ধে যেমন বিস্তারিত আলোচনা করা আছে। সে রকমই আমাদের দেশের কৃষকরা কী ধরনের কৃষিকার্য করতো সেই সম্বন্ধেও অনেক কিছু লেখা আছে। এছাড়াও প্রাচীন ভারতে কী ধরনের শিল্প ছিল সে বিষয়েও বেশ কিছু তথ্য আছে। তাঁর বিভিন্ন লেখায় মাধুর্য হয়তো ছিল না, কিন্তু ছিল বিশ্লেষণ এবং যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা।

অক্ষয় কুমার দত্ত নীলকর সাহেবদের নিষ্ঠুর অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁর শক্তিশালী কলম ধরেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় এর বিরুদ্ধে লেখার মাধ্যমে তিনি অগ্নি বর্ষণ করেন। খ্রিস্টান মিশনারিদের হিন্দুদের খ্রিস্টান মতে ধর্মান্তরিত করার মরিয়া প্রয়াসকে অক্ষয় কুমার দত্ত তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ করতেন।

<u>তথ্যসূত্র :</u>

১. মহেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীযুক্তবাবু অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন-বৃত্তান্ত, কলকাতা, সংস্কৃত যন্ত্র, ভাদ্র ১২৯২;

২. অক্ষয় কুমার দত্ত, আশীষ লাহিড়ীর (দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা বাংলায় আঁধার রাতে একলা পথিক) আইএসবিএন 81-295-0789-7)

৩. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, মাঘ ১৩৮৮;

৪. বাংলা সাহিত্যের কথা, সুকুমার সেন, সপ্তম সংস্করণ। পৃ. ১৯৩;

৫. অসিতকুমার ভট্টাচার্য, অক্ষয়কুমার দত্ত ও উনিশ শতকের বাংলায় ধর্ম ও সমাজচিন্তা, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি ২০০৭;

৬. মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম, অক্ষয়কুমার দত্ত ও উনিশ শতকের বাঙ্গলা, ঢাকা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, আগস্ট ২০০৯।

বর্ধমানের বিখ্যাত দুই মিষ্টি সীতাভোগ ও মিহিদানা

শেখর সেনগুপ্ত

আমার শৈশব ও যৌবনের একাংশ অতিবাহিত হয়েছে বর্ধমান শহরে। শিক্ষা বর্ধমান বাণীপীঠ উচ্চতর বিদ্যালয়, বর্ধমান রাজ কলেজে এবং বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রথমাবধি ইতিহাসচর্চাটা যেন প্রায় নেশা। এখনও লেখালেখিতে ইতিহাস হানা দেবেই। তাই বর্ধমানের বিখ্যাত দুই মিষ্টি সীতাভোগ ও মিহিদানার উৎপত্তি নিয়েও কম ভাবিনি। সাধক কমলাকান্তের মন্দিরে যতবার গিয়েছি, পূজার প্রসাদে সীতাভোগ ও মিহিদানার উপস্থিতি অনিবার্য হয়ে উঠেছে।

১৯০৪ সালের জানুয়ারিতে বর্ধমানের মহারাজা বিজয়চাঁদ বড়লাট কার্জনকে সীতাভোগ ও মিহিদানা খাইয়ে খুব খুশি করেছিলেন বলে শোনা যায়। বর্ধমানে তো হিন্দুদের দেব-দেবীর মন্দির যেন প্রায় সংখ্যাতীত। বিদ্যাসুন্দরের কালীবাড়ি, মা সর্বমঙ্গলার মন্দির, একসঙ্গে একশো আটটি শিবমন্দির, সাধক কমলাকান্তের নিবাস সংলগ্ন মন্দির, রাজবাড়ির অভ্যন্তরে হিন্দুদের বহু দেব-দেবীর মন্দির, যাদের অন্যতম লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির। ওই সকল মন্দিরে গেলেই প্রসাদ মেলে— যে প্রসাদে প্রায়শ আপনি পাবেন সীতাভোগ ও মিহিদানাকে। দুর্গাপূজার এক-একটি দিনে শহর বর্ধমানে তৈরি হয়ে থাকে প্রায় বিশ-বাইশ কুইন্টাল সীতাভোগ ও মিহিদানা। শোনা যায়, বর্ধমানের মহারাজা মহতাবচাঁদ ইংরেজ শাসকদের তুষ্ট করতে ওই দুই মিষ্টি বঙ্গপ্রদেশ তথা ভারতের নানাস্থানে পাঠাতেন। স্থানীয় প্রবীণদের মুখে শুনেছি, ভারতবিখ্যাত ময়রা ভৈরবচন্দ্র নাগ এবং তাঁর পুত্র নগেন্দ্রচন্দ্র নাগ ওই সীতাভোগ- মিহিদানা প্রথম তৈরি করে তাদের বাজারজাত করেন।

১৯০৪ সালে বড়লাট কার্জন বর্ধমানে এসে সীতাভোগ-মিহিদানা খেয়ে খুব মোহিত হন এবং তিনি একে অমৃতের সঙ্গে তুলনা করেন। সীতাভোগ-মিহিদানার মিষ্টিত্ব ও ঐতিহ্যের বর্ণনা ব্যাপকভাবে ধ্বনিত হয়েছিল বেতারে ১৫ নভেম্বর, ১৯৭৬। সেখানে স্বয়ং নগেন্দ্র চন্দ্র নাগ বলেছিলেন, ‘‘বর্ধমানের স্বনামধন্য মহারাজা স্বর্গীয় মহতাবচাঁদ বাহাদুরের উৎসাহে তাঁর আয়োজিত লাটসাহেবের ভোজসভায় আমার স্বর্গীয় পিতামহ ক্ষেত্রনাথ নাগ বর্ধমানে প্রথম খাস মিহিদানা ও সীতাভোগ আবিষ্কার করত: সকলের প্রশংসা অর্জন করেন। এর ৭২ বছর আগে আমার পিতা স্বর্গীয় ভৈরবচন্দ্র নাগ বর্ধমানের গোলাপবাগে কার্জন সাহেবের সম্মানে স্বর্গীয় মহারাজ বিজয়চাঁদ মহতাব কর্তৃক আয়োজিত ভোজসভায় আমারই পিতামহের আবিষ্কৃত মিহিদানা ও সীতাভোগের সূক্ষ্ম দানা ও নানাপ্রকার মশলা, বাদাম সংযোগে নাড়ুতে রূপান্তরিত করে কেবলমাত্র হিন্দুদের সেই ভোজসভায় পরিবেশন করত: বর্ধমানের মহারাজা কার্জন সাহেবের প্রশংসাপত্র গ্রহণ করেন।’’

আজও যখন আমি বর্ধমানে পা রাখি, কোনও না কোনও মিষ্টির দোকানে ঢুকে সীতাভোগ ও মিহিদানার স্বাদ গ্রহণ করি এবং কাজ সেরে কলকাতায় ফিরে আসবার সময় এই দুই মিষ্টিরই প্যাকেট সঙ্গে আনি। □

শীতের শরীরের সমস্যাকে প্রতিরোধ করে শরীর নিজেই

শীতে শরীরের সমস্যায় ওষুধ ছাড়া কীভাবে সুস্থ থাকা যায়, সে সম্পর্কে বললেন সিনিয়র শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ, ডাঃ উত্তম মজুমদার

আমাদের কাছে বছরের ছয়টি ঋতু আগে একটি নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলত। এখন সেই নিয়ম আর কই? আগে আমাদের অনুভূতি জানিয়ে দিত, কোনটি কোন ঋতু। আর এখন জানিয়ে দেবার সে সুযোগ নেই। এই শীতের কথাই ধরুন, গত কয়েক বছর ধরে মাত্র এক মাসের মতো অস্তিত্ব। সেটাও কখন আসে, আর কখন যে যায় বোঝাই যায় না। একটাই কারণ, বিশ্ব উষ্ণায়ন। শরীরে নানা সমস্যা কিন্তু তৈরি হচ্ছে এই ঋতুর খামখেয়ালিপনার জন্যই।

সমস্ত ঋতুতেই আমরা নানা শরীরের সমস্যায় ভুগতে থাকি। কিন্তু শীতকালে একটু বেশি করে যেন বাচ্চা ও বড়োদের মধ্যে সমস্যাগুলি দেখা দেয়। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এই শীত আসার আগে ডেঙ্গু বা ম্যালেরিয়ার একটা প্রকোপ আমরা দেখেছি। এর থেকে প্রাণহানির বিষয়টাও আমরা দেখেছি।

শীত এলেই সেই প্রকোপটা কিন্তু আর থাকে না। যেটা হয় ঋতুর পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণে, অর্থাৎ গরম থেকে ঠান্ডা বা ঠান্ডা থেকে গরমের সময় আসে, সেই সময়টাতে শরীরে নানা সমস্যা দেখে দেয়। যেমন একটা কমোন রোগ দেখা দেয়, সেটা হলো, সর্দি-কাশি, নাক দিয়ে জল পড়ছে, কারও কারও আবার জ্বর হচ্ছে। এই সমস্যাটা প্রায় অধিকাংশ মানুষের কাছে ঋতু পরিবর্তনের সময়কার একটা সাধারণ বিষয়। আমরা সবাই খুব চিন্তিত হয়ে পড়ি। চিকিৎসকের কাছে দৌড়াই। আমার ব্যক্তিগত মত হলো এতে ভয় পাবার কিছুই নেই। এমনকী আমি চট জলদি কোনও ওষুধ খেতেও বারণ করব। দেখা গেছে এই ধরনের সমস্যা শরীর নিজেই সামলে নিয়েছে। ওষুধের দরকার হয়নি। কিন্তু আমরা ধৈর্য ধরতে পারি না। সেটাই স্বাভাবিক। অনেক সময় দেখি এই ঋতু পরিবর্তনের সময় একজন খুব কাশছেন। আমাদের কাছে এলেন, আমরা অ্যান্টিবায়োটিক সমেত কাশি কমানোর জন্য এক গাদা ওষুধ লিখেও দিলাম। খুব সহজ কথায় বলি, আমি সাময়িক ভাবে এর বিরুদ্ধে। এই ধরনের কাশি ওষুধ খেলেও কমতে যে সময় নেবে, ওষুধ না খেলেও সেই সময় নেবে। শরীরের নিজস্ব রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতায় সেই সমস্যা মিটে যায়। তবে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে, তখন তো আর চিকিৎসকের কাছে যাওয়া ছাড়া উপায় থাকে না।

আমাদের শরীরকে সুযোগ দিতে হবে। সেই সুযোগ দিতে গেলে সামান্য কয়েকটি সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। যেমন খালি গা বা হালকা জামাকাপড় একেবারেই পরা চলবে না। গরমকালে যেমন খালি গায়ে থাকলাম, ঠান্ডা জলে স্নান করলাম। গরমকালের মতো দু'বার স্নান করলাম, আবার দিনেরবেলা গরম থেকে ঘুরে এসেই স্নান করলাম, এসব কিন্তু করা চলবে না। এই সময়ে অ্যালার্জির কারণে আমাদের শরীরে চলতি ভাষায় ঠান্ডা লেগে যায়। আর তার ফল ভোগ করতে হয় নিজেকেই। শীতে শরীরকে জামাকাপড়ে ভালো করে ঢাকব, ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করব।

শীতের সময় ফুসফুসের সংক্রমণ, হৃদ্‌পিণ্ড সংক্রান্ত কোনো সমস্যা দেখা দিয়ে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে, ব্যবস্থা নেবেন। □

ফঃ ৫

শীতে জল পানের মাত্রা ঠিক রাখতে হবে

সৌরভ সিংহ

হেমন্তের হিমেল বাতাসের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের জলপান করার মাত্রা হ্রাস পেতে শুরু করে। শরীর ঠিক রাখতে জল পানের গুরুত্ব কম-বেশি আমরা সবাই জানি। কিন্তু সেই হিসেব কষে জল পান করার কাজটা শীত পড়তে না পড়তেই উধাও হয়ে যায়। এমনিতেই ঠাণ্ডার সময় পিপাসা পাবে কম। তারপর জল যদি হয় ঠাণ্ডা, তাহলে তো আর কথাই নেই। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় শিশু থেকে বৃদ্ধ— সারদিনে হয়তো ১ লিটারও জল পান হয়নি। তাই আবার মনে সংশয়, কতটা জলপান শীতকালে প্রয়োজনীয়? জল গরম করে খাওয়া উচিত কিনা, কতটা গরম শরীরের জন্য ভালো ইত্যাদি। কী বলছেন ডাক্তার থেকে পুষ্টিবিদ সেই নিয়েই চর্চা।

সাধারণ চিকিৎসা বিজ্ঞান বলে, মানব শরীরে দৈনিক গড়ে ২.৫ থেকে ৩.৮ লিটার জলের প্রয়োজন হয়। শরীরের গঠন ও কাজকর্ম, খ্যাদ্যাভ্যাস এবং সর্বোপরি পাচনতন্ত্রের কর্মক্ষমতা অনুসারে বিভিন্ন মাত্রায় জলের প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে মহিলাদের শরীরে ২.৫-৩.২ লিটার এবং পুরুষের শরীরে ২.৮-৩.০ লিটার পর্যন্ত জলের প্রয়োজন পড়ে। গ্রীষ্মকালে যেমন জলের অভাবে জলশূন্যতা হয়, শীতেও হয়। বলা ভালো, শীতকালে শরীরে জলশূন্যতার প্রভাব আরও ভয়াবহ। শীতকালে জলতৃষ্ণা কম পায়, তাই অনেকের ধারণা, শীতকালে শরীরে জলের প্রয়োজনীয়তা কম। তা কিন্তু একেবারেই নয়, বরং এক্ষেত্রে জলের অভাবে শরীরে অজান্তেই ডিহাইড্রেশন শুরু হয়। খুব ধীরে ধীরে এর প্রভাব আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর পড়ে। চিকিৎসকদের মতে প্রাথমিক লক্ষণ হলো প্রস্রাব হলদে হয়ে যাওয়া, ত্বকের শুষ্কতা, ক্লান্তি, মাথাধরা, নিম্ন রক্তচাপ ও পায়ে ফোলা ভাব।

শীতের মরসুম মানেই খাওয়া-দাওয়ার একটা হুজুগ শুরু হয়। বিয়ে বাড়ি, পিকনিক ইত্যাদি। সাধারণ ধারণা আছে শীতে আমরা যা খাব তাই হজম হবে। কিন্তু শরীরে যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে জল না পৌঁছায়, সেক্ষেত্রে হজম প্রক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হয়। পরিপাক, রেচন সম্পূর্ণ রূপে জলের উপর নির্ভরশীল। জলের অভাবে খাবার ভাঙার প্রক্রিয়া ঠিক মতো হয় না। শরীরে অতিরিক্ত তাপমাত্রা বৃদ্ধি ঘটে, কোষ্ঠকাঠিন্যের মতো সমস্যারও সম্মুখীন হতে হয়। রেচন জাতীয় শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অবিরত জল আমাদের শরীর থেকে বেরিয়ে যেতে থাকে। সেই পরিমাণ জল যদি আমরা আবার শরীরকে

ফিরিয়ে না দিই, তাহলে শরীরের প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। কারণ শরীর থেকে জলীয় (তরল) পদার্থের নির্গমন শুধু হয় না, সঙ্গে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইলেক্ট্রোলাইটস্ যেমন : সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম ইত্যাদি খনিজগুলোও আমরা হারিয়ে ফেলি। এর ফলে শরীরের খনিজের ভারসাম্যতা খর্ব হয়।

অনেক ক্ষেত্রে স্নায়ুরোগ ও হৃদ সংক্রান্ত রোগও প্রকাশ পায়। ইলেকট্রোলাইটস্ শরীরে হতে থাকা শারীরবৃত্তীয় জৈব প্রক্রিয়ায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়। যেমন উৎসেচকের সহযোগী ধাতব আয়ন কো-ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে, যা জলশূন্য অবস্থায় সম্পূর্ণ অকার্যকর অবস্থায় চলে যায়। অগ্ন্যাশয় ও পিত্ত দুই-ই তার কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। রেচন-ক্রিয়া জলের অভাবে ঠিকমতো না হওয়ায় প্রস্রাব ও মলের পরিমাণ কমে আসে। মল শক্ত হয়ে আসা একটি সাধারণ লক্ষণ। কিডনির উপর চাপ পড়ে।

শরীরে থাকা দূষিত পদার্থ শরীর থেকে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় নির্গত না হয়ে চামড়ার দ্বারা প্রকাশ পায়। তাই চর্মরোগ বিশেষ করে ছোটো ছোটো লাল দাগ সর্বত্র দেখা যায়। এছাড়া শীতকালে শরীরের তাপমাত্রার ভারসাম্য বজায়ে জল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত শীতে ঘাম কম হওয়ায় আমাদের শরীরের জলীয় (তরল) ভারসাম্য ঠিক রাখতে কিডনির দ্বারা বেশি পরিমাণে প্রস্রাব তৈরি হয়, যাকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় বলে Cold diuresis। কিন্তু জলের ঘাটতি থাকলে এটি হতে পারে না। ফলস্বরূপ Kidney stone এখন খুব বেশি পরিমাণে দেখা যাচ্ছে।

তাই ডাক্তার থেকে পুষ্টিবিদ সবাই শীতের এই ৩ থেকে ৪ মাস জল পানের উপর অতিরিক্ত যত্ন নেওয়ার কথা বারবার বলছেন। গ্রীষ্ম বা বর্ষা, শরৎ অথবা শীতে প্রত্যেককে পর্যাপ্ত পরিমাণে জল পান করতেই হবে। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রেও জল পানে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। একটি সমীক্ষার রিপোর্ট অনুযায়ী শীতকালে শরীরের জলের চাহিদা প্রায় ৪০ শতাংশ কমে আসে। তাই আমাদের বিশেষভাবে গুরুত্ব সহকারে জল পান করা উচিত। এক্ষেত্রে উষ্ণ পানীয় যেমন চা ও কফি আমাদের জলের চাহিদাকে আরও কমিয়ে দেয়। শীতের প্রভাবে শরীরে জল কম থাকায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে রক্ত-সঞ্চালনের গতি কম থাকে। এই সময়ে উষ্ণ-পানীয় মানসিক ভাবে চাহিদার তালিকায় প্রথমে থাকে। কিন্তু তাতে তৃষ্ণা কম হয়, জলের চাহিদা বেড়ে যায়। তাই আমাদের নির্দিষ্ট পাত্রে মেপে জল খাওয়ার অভ্যাস থাকলে ভালো। প্রয়োজনে ফলের রস দ্বারাও চাহিদার নিবৃত্তি করতে পারি। এতে আমাদের শরীরের অনাক্রম্যতা শক্তিরও বৃদ্ধি ঘটে। এক্ষেত্রে ঈষদুষ্ণ জল সবচেয়ে কার্যকর। কিন্তু বেশি উষ্ণ পানীয় খাবেন না।

অনেক ক্ষেত্রে মদ্যপানকে শীত থেকে বাঁচার উপায় হিসেবে অনেকে মনে করেন। খুব কম পরিমাণ মদ্যপান শরীরকে Hypothermia থেকে রক্ষা করলেও জলের পরিবর্তে তা কখনোই নয়। অবশ্যই আমাদের মাথায় রাখতে হবে তৃষ্ণা না পাওয়াটাও ডিহাইড্রেশনের কারণে হতে পারে। তাই শরীরের আর্দ্রতা যথাযথ ভাবে ধরে রাখতে ও সর্বোপরি শীতে সর্বাঙ্গীন সুস্থ্য থাকতে পরিমান মতো জল পান নিয়ম মেনে করতে হবে।

International Water Association-এর একটি প্রকাশিত গবেষণাপত্র অনুযায়ী পর্যাপ্ত পরিমাণে জল পান হাত ও পায়ের তালুর তাপমাত্র নিয়ন্ত্রণে সক্ষম। American Heart Association-এর Recommendation বলছে— জল পানের জন্য তৃষ্ণা পাওয়ার অপেক্ষা না করে নির্দিষ্ট সময়ের অন্তর খুব কম পরিমাণে জল বারে বারে পান করার অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত। তাই যতই আমরা শীতকে ভয় পাই না কেন, সুস্থ থাকতে হলে পরিমিত জল পান আমাদের করতেই হবে। □

পরলোকে শক্তিপদ পাল

কামারপুকুর খণ্ডের সঙ্ঘস্থপতি তথা খণ্ড সঙ্ঘচালক শক্তিপদ পাল গত ২২ নভেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। রেখে গেছেন ২ পুত্র-সহ অসংখ্য গুণমুগ্ধ স্বয়ংসেবক ও কার্যকর্তা। তাঁর ২ পুত্রই স্বয়ংসেবক। জ্যেষ্ঠপুত্র সঞ্জীব পাল বাঁকুড়া নগর কার্যবাহের দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর কনিষ্ঠভ্রাতা রমাপদ পাল বর্তমানে পূর্বক্ষেত্র প্রচারকের দায়িত্ব পালন করছেন।

কর্মজীবনে শক্তিপদ পাল তাজপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বাণীপুর পি.জি.বি.টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ নেওয়ার সময় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক হন। প্রশিক্ষণ শেষে নিজের গ্রামে শাখা শুরু করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় ক্রমে এলাকায় শাখার বিস্তার হয়। তাঁর উদ্যোগেই গ্রামে সরস্বতী শিশুমন্দির ও সেবাকেন্দ্র স্থাপিত হয়। যাকে কেন্দ্র করে নানা ধরনের সেবা প্রকল্প, গ্রাম বিকাশ সমিতির কাজ চলছে।

বিশ্বকাপ ক্রিকেটে হারের পর ভারতীয় ক্রিকেটারদের উৎসাহ দিয়ে নজির গড়লেন প্রধানমন্ত্রী

নিলয় সামন্ত

এপর্যন্ত বিশ্বকাপ ক্রিকেট খেলা হয়েছে তেরো বার। তার মধ্যে ওয়েস্ট ইন্ডিজ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে দু'বার। ভারত চ্যাম্পিয়ন

হয়েছে দু'বার। অস্ট্রেলিয়া চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ছ'বার। পাকিস্তান একবার। শ্রীলঙ্কা একবার। ক্লাইভ লয়েড ওয়েস্ট ইন্ডিজের অধিনায়ক হিসেবে কাপ জিতেছেন দু'বার ১৯৭৫ ও ১৯৭৯ সালে। রিকি পন্টিং অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক হিসেবে কাপ জিতেছেন দু'বার ২০০৩ আর ২০০৭ সালে। প্রথম তিনটি বিশ্বকাপ ক্রিকেট খেলা হয়েছিল ইংল্যান্ডে। তিনটি বিশ্বকাপ ক্রিকেটের ফাইনালই হয়েছিল লর্ডসের মাঠে। এই তিনটে বিশ্বকাপের খেলা ছিল ৬০ ওভারের। তাই ষাট ওভারের বিশ্বকাপ ক্রিকেট জেতার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন মাত্র দু'জন অধিনায়ক। এরা হলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্লাইভ লয়েড, আর ভারতের কপিল দেব। এরপর সব খেলাই হয়েছে ৫০ ওভারের। ১৯৮৭ সালে ভারত-পাকিস্তান যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত চতুর্থ বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া দলের অধিনায়ক ছিলেন অ্যালান বর্ডার। ১৯৯২ সালে অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ড যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত পঞ্চম বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা। এবারের ফাইনাল হয়েছিল পাকিস্তানের লাহোরে। ষষ্ঠ বারের এই আসরে চ্যাম্পিয়ন শ্রীলংকা দলের অধিনায়ক ছিলেন অর্জুন রনাতুঙ্গা। ১৯৯৯ সালে আবার বিশ্বকাপ ক্রিকেটের আয়োজন করে ইংল্যান্ড। সপ্তম বারের এই আসরে চ্যাম্পিয়ন হয় অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক ছিলেন স্টিভ ওয়া। এটি ছিল অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় বিশ্বকাপ জয়।

এ পর্যন্ত তিনটি দেশ ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ ক্রিকেট জিতেছে। ২০১৫ সালে অস্ট্রেলিয়া। ২০১১ সালে ভারত। আর ২০১৯ সালে ইংল্যান্ড। আর ভারতই হলো একমাত্র দেশ যারা একটি বিশ্বকাপে দশটি ম্যাচ জিতেছে। বিশ্বকাপের মূল পর্বে খেলতে আসা সবকটা দেশকে সরাসরি হারিয়েছে। এই রেকর্ড অন্য কোনও দেশের নেই। রেকর্ডটি হয়েছে চলতি বছরের ২০২৩ বিশ্বকাপ ক্রিকেটে।

খেলায় হারজিৎ আছেই। তবে দশটা ম্যাচ জেতার পরে যখন একাদশতম ম্যাচটি অর্থাৎ ফাইনালে ভারত হারে তখন ভারতবাসী দুঃখে ভেঙে পড়ে। বহু সমর্থক কান্না সামলাতে পারেনি। খাওয়া বন্ধ হওয়ার জোগাড়। মুহূর্তের মধ্যে সারা দেশে নেমে আসে শোকের ছায়া। সমগ্র প্রতিযোগিতায় যে দল এতগুলো ম্যাচ ভালো খেললো তাদের এই হার সত্যিই অবিশ্বাস্য। কিন্তু বিশেষ করে ক্রিকেট খেলায় একটা ব্যাপার আছে। পিচ খেলার অনুকূল হতে হবে। এগারো জন খেলোয়াড়কে একই সঙ্গে ফর্মে থাকতে হবে। টস ঠিক মতো না জিততে পারলে খেলা নাকি ওখানেই শেষ। 'ল অব অ্যাভারেজ' বলে একটা ফ্যাক্টর আছে।

তবে ফাইনাল ম্যাচে ভারতের পরাজয়ের পর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান শেষে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সরাসরি পৌঁছে যান ভারতীয় ক্রিকেট দলের ড্রেসিংরুমে। ক্রিকেটার, কোচ ও সাপোর্ট স্টাফদের পাশে দাঁড়িয়ে এদিনের পরাজয়ের গ্লানিকে মুছে ফেলে সামনে এগিয়ে চলার বার্তা দেন তিনি। ভারতীয় দলের সঙ্গে যুক্ত সদস্যদের সঙ্গে করমর্দন ছাড়াও বিশ্বকাপে একনাগাড়ে ১০টি ম্যাচ জয়ের কৃতিত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে প্রত্যেকের পিঠ চাপড়ে উৎসাহিত করেন। পেস বোলার মহম্মদ শামিকে আলিঙ্গনের সময়ে প্রধানমন্ত্রীর বাহুডোরে বাঁধা পড়ে শামির কেঁদে ফেলার আবেগঘন মুহূর্তটি সমস্ত ক্রিকেটার থেকে ক্রিকেটপ্রেমীর মন ছুঁয়ে গেছে। ফাইনাল ম্যাচে হারের পরে প্রধানমন্ত্রীর তরফে ক্রিকেটারদের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁদের উদ্বুদ্ধ করার এই দৃশ্য বিরল। দেশের অসংখ্য মানুষ যেমন এই ঘটনার প্রশংসা করেছেন তেমনই ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেট দলের কোচ রবি শাস্ত্রী-সহ বহু ক্রীড়াবিদও প্রধানমন্ত্রীর এই ভূমিকার স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন জানিয়েছেন। □

‘মৈতৈ জগোই’-এর সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব শান্তিনিকেতনে

প্রবীর ভট্টাচার্য

দেশের নৃত্য জগতের অত্যন্ত সুপরিচিত, মণিপুরী নৃত্যের বিশিষ্ট শিল্পী, সংগীত নাটক অ্যাকাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত দেবযানী চলিহার নৃত্য প্রতিষ্ঠান ‘মৈতৈ জগোই’-এর পঞ্চাশ বছর পূর্তি উৎসব অনুষ্ঠিত হলো গত ৪ ও ৫ নভেম্বর শান্তিনিকেতনের পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রের সৃজনী শিল্পগ্রামে।

‘মৈতৈ জগোই’ শব্দ দুটি ভিন্ন ভিন্ন অর্থ রয়েছে। মণিপুরী ভাষায় এই শব্দ দুটি ভারতীয় নৃত্যের ধারক ও বাহক। মৈতৈ অর্থাৎ মণিপুরী এবং জগোই অর্থে নৃত্য। ভরতমুনি তাঁর নাট্যশাস্ত্রে উল্লেখ করেছেন,

অঙ্গা বঙ্গা উৎকলিঙ্গা।
বৎসাশ্চৈবৌড্রমাগধা।।

নাট্যশাস্ত্রের চতুর্দশ অধ্যায়ে ভারতবর্ষে চার প্রকার নৃত্যধারার উল্লেখ রয়েছে। অবন্তী, দাক্ষিণাত্য, পাঞ্চালী ও ঔড্রমাগধী। চতুর্থ এই ঔড্রমাগধী বলতে গৌড়বঙ্গ-সহ তৎসন্নিবিষ্ট অঞ্চলগুলি বোঝাচ্ছে। মণিপুরীনৃত্য এই ঔড্রমাগধী নৃত্যধারা।

মণিপুরে লাই শব্দের অর্থ দেবতা। মণিপুরের প্রাচীন পুরাণে বর্ণিত আছে যে নয়জন দেবতা ও সাতজন দেবী এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। আদিতে পৃথিবী জলমগ্ন ছিল, আর সেই জলের উপরে সাতজন দেবী নৃত্য করছিলেন। এই দৃশ্য দেখে নয়জন দেবতা স্বর্গ থেকে দেবীদের লক্ষ্য করে মৃত্তিকা নিক্ষেপ করেন। নৃত্যরতা সাতজন লাইনু সেই মাটির উপর নেচে নেচে স্থলভাগ তৈরি করেন। পুরাণের এই কাহিনিতে এটা স্পষ্ট বোঝা যায় যে প্রাচীন ভারতীয় জনপদ ও সভ্যতায় নৃত্যের ভূমিকা কত প্রবল ছিল। এক সময় মণিপুরে শৈবমতের প্রভাব ছিল। দেবতা শিবের প্রতীক হিসেবেই ‘লাই’ শব্দকে শিবলিঙ্গের প্রতীক ভাবা হতো। সপ্তদশ শতকে পামহৈবা রাজত্বলাভের পর মণিপুরে বৈষ্ণবীয় প্রভাব বিস্তর হয়। রামানন্দের ভাবদর্শে বিশ্বাসী হয়ে রাজা পামহৈবা বৈষ্ণবমত গ্রহণ করায় সমগ্র মণিপুরে বৈষ্ণবমতের প্রাবল্য লক্ষ্য করা গেছে। ফলে এই সময় থেকেই মণিপুরের কলাশিল্পে বৈষ্ণবীয় প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ত্রিপুরার রাজসভায় মণিপুরের নৃত্যশৈলী দেখে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ অভিভূত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মর্মে স্পর্শ করা মণিপুরী নৃত্য আশ্রমের নৃত্যধারার প্রধান উপাদান হয়ে আজও বয়ে চলেছে তার নিজস্ব ধারায়। পদ্মশ্রী নৃত্যগুরু মাইস্নাম আমুবি সিংহের সংস্পর্শে আসেন ‘মৈতৈ জগোই’ নৃত্যশিক্ষা কলাকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাত্রী দেবযানী চলিহা। ১৯৫৭ সালে নৃত্যাচার্য গুরু উদয়শঙ্করের প্রেরণ ও উৎসাহে দেবযানীদিদি মণিপুরে যান নৃত্যশিক্ষা গ্রহণ করতে। পাশাপাশি ধনমঞ্জরী কলেজে শুরু করেন দর্শন বিভাগের অধ্যাপনা। নৃত্যগুরুর গৃহে বসবাস করায় এই অসম দুহিতা নিজেকে মণিপুরী হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত করেন। ধীরে ধীরে তিনি পরিচিত হন ‘ইনে মীনাক্ষী’ অর্থাৎ মণিপুরের পিসিমা। গুরুজীর সঙ্গলাভ, আশীর্বাদ ও সাহায্যে ১৯৭১ সালে শুরু হয় ‘মৈতৈ জগোই’-এর পথ চলা।

শান্তিনিকেতনের সৃজনী শিল্প গ্রামে আয়োজিত দু'দিনের এই উৎসবে উপস্থিত ছিলেন পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রের অধিকর্তা আশিস গিরি, জওহরলাল নেহরু মণিপুর নৃত্য অ্যাকাডেমির প্রাক্তন অধিকর্তা এল উপেন্দ্র, বিশিষ্ট কবি অনিরুদ্ধ রায়চৌধুরী, সংস্কার ভারতী, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সংগঠন সম্পাদক উদয় কুমার দাস, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃত্য বিভাগের অধ্যাপক ড. সুমিত বসু প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে দু'দিনে মণিপুরী নৃত্য ধারার বিভিন্ন নৃত্যানুষ্ঠান ছাড়াও নৃত্যগুরু দেবযানী চলিহার বর্ণময় জীবন নিয়ে প্রদর্শিত হয় একটি তথ্যচিত্র এবং মণিপুরী নৃত্য প্রতিষ্ঠান ‘মৈতৈ জগোই’-এর সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত একটি ঝকঝকে স্মরণিকা। □

অকারণ কথা বলা ভালো নয়

এক রাজা ছিলেন। তাঁর মনে খুব দুঃখ যে তাঁর কোনো সন্তান ছিল না। একবার নগরে এক সন্ন্যাসী এসেছিলেন। রাজা তাঁর কাছে গিয়ে সন্তানের জন্য প্রার্থনা জানালেন। সন্ন্যাসী বললেন, মহারাজ, আপনার প্রারব্ধে কোনো সন্তান নেই। আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারবো না। রাজা অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে ফিরে চললেন। পথিমধ্যে আর একজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা হলো। ইনি সেই সন্ন্যাসীর শিষ্য। রাজা তাঁর কাছেও সন্তানের জন্য প্রার্থনা জানালেন। সন্ন্যাসী বললেন,

চিন্তা করবেন না, আপনার পুত্রসন্তান হবে। রাজা আনন্দিত মনে প্রাসাদে ফিরে এলেন।

এদিকে এই সন্ন্যাসীর গুরু জানতে পারলেন যে তাঁর শিষ্য রাজাকে পুত্রসন্তানের আশীর্বাদ দিয়েছেন। তিনি মনে মনে খুব অসন্তুষ্ট হলেন। শিষ্যকে ডেকে বললেন, রাজার ভাগ্যে সন্তান প্রাপ্তির যোগ নেই, তুমি কেন একে সন্তানপ্রাপ্তির আশীর্বাদ দিলে? শিষ্য বলল, কী করবো প্রভু, রাজার বিষণ্ণ মুখ দেখে বলে ফেলেছি। গুরুদেব বললেন, তোমার নিজের কথা সত্য করার জন্য তোমাকেই রাজার পুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করতে হবে।

কিছুকাল পরে রাজা পুত্রসন্তান লাভ করলেন। পুত্রটি সর্বসুলক্ষণযুক্ত, কিন্তু সে কথা বলতে পারে না। অনেক বড়ো বড়ো ডাক্তার, কবিরাজ দেখানো হলো কিন্তু কোনো লাভ হলো না। রাজা তাঁর রাজ্যে ঘোষণা করতে আদেশ দিলেন যে, যে রাজকুমারকে কথা বলাতে সক্ষম হবে তাকে বহুমূল্য উপহার দেওয়া হবে। বহু লোক এল রাজকুমারের চিকিৎসা করাতে, কিন্তু কেউ সফল হলো না।

এভাবে দিন কাটতে লাগল। রাজকুমারও বড়ো হতে লাগল। রাজকুমারের মন ভালো করার জন্য একদিন রাজার লোকেরা রাজকুমারকে নিয়ে বনে ঘুরতে গেল। ঘুরতে ঘুরতে তারা দেখল, এক পাখি শিকারি ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে পাখি ধরার জন্য। এই বনের পাখিগুলি নিঃশব্দে পাতার মধ্যে লুকিয়ে ছিল। হঠাৎ একটি পাখি ডেকে উঠতেই শিকারি সেটাকে তির ছুঁড়ে মেরে ফেলল। তা দেখেই রাজকুমার বলে উঠল— 'কথা বলেই মরল'।

রাজকুমারের মুখে কথা শুনে তার সঙ্গে আসা লোকেরা অত্যন্ত আনন্দিত হলো। তারা শিবির গুটিয়ে রাজধানীতে ফিরে এসে রাজকুমারের কথা বলার খবর রাজাকে দিল। রাজা বললেন— 'আমার সামনে কথা বলাও, তাহলেই আমি বিশ্বাস করবো।' রাজ অনুচরেরা অনেক চেষ্টা করল, অনেক সাধাসাধি করল, কিন্তু রাজকুমার চুপ করেই থাকল। কোনো কথা তার মুখ থেকে বেরুলো না।

রাজা রেগে গিয়ে বললেন— 'তোমরা আমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য মিথ্যে কথা বলেছ, তোমাদের সবাইকে ফাঁসির আদেশ দিলাম।' এই কথা শুনেই রাজকুমার বলে উঠল— 'কথা বলেই মরল'।

রাজকুমারের মুখে কথা শুনে রাজা আশ্চর্য হলেন। তিনি রাজকুমারকে বললেন, ঠিক করে বলো, তুমি কী বলতে চাও?' রাজকুমার বলল, মহারাজ, আমি সেই সন্ন্যাসী যে আপনাকে পুত্রসন্তানের আশীর্বাদ দিয়েছিল। আপনার ভাগ্যে সন্তান ছিল না, তবু আমি বেশি কথা বলার ফাঁকে অহংকারবশত আপনাকে আশীর্বাদ দিয়ে ফেলেছিলাম। সেজন্য আমাকেই আপনার ঘরে জন্ম নিতে হয়েছে। আমি যদি সেদিন অকারণ কথাটি না বলতাম, তাহলে আমাকে আমার সাধনলব্ধ জীবন ছেড়ে আপনার ঘরে জন্ম নিতে হতো না। বনের মধ্যে পাতার আড়ালে বসে থাকা পাখিটি যদি ডেকে না উঠত, তাহলে তাকেও মরতে হতো না। আপনার অনুচরেরা যদি আমার কথা বলার সংবাদটি আপনাকে না দিত তাহলে তাদেরও মরতে হতো না। মহারাজ, এসবই কথা বলার পরিণাম। বেশি কথা বললেই বিপদে পড়তে হয়। এই যে এখন আমি বেশি কথা বলে ফেললাম, তাই আমারও প্রাণ এখনই যাবে। এই বলে রাজকুমার মাটিতে পড়ে গেল। রাজবৈদ্য ছুটে এসে দেখল, রাজকুমারের প্রাণবায়ু নির্গত হয়েছে।

ছোটো বন্ধুরা, সবসময় মনে রাখবে, অকারণ এবং বেশি কথা বললে শুধু বিপদই বাড়ে।

গায়ত্রী বন্দ্যোপাধ্যায়

বীর বনবাসী

নানক ভীল

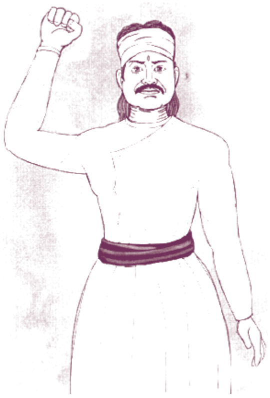

জন্ম ১৮৯০ সালে রাজস্থানের বরাড় জেলার ধনেশ্বর গ্রামে। বাল্যকাল তেকেই তিনি সাহসী ও সচেতন প্রকৃতির ছিলেন। তিনি গোবিন্দ গুরু এবং মোতিলাল তেজাবতের আন্দোলনে প্রভাবিত ছিলেন। কৃষক আন্দোলনের পুরোধাপুরুষ ছিলেন তিনি। তিনি ঝান্ডাগীতের মাধ্যমে তাঁর সমাজের মানুষদের ইংরেজদের অত্যাচার শোষণের বিরুদ্ধে সচেতন করতেন। ১৯২৩ সালের ২ এপ্রিল বুঁদি গ্রামে কৃষকদের এর সমাবেশে ব্রিটিশ পুলিশ গুলি চালালে নানকজীর নেতৃত্বে হাজার হাজার ভীল ঝান্ডাগীত গেয়ে ব্রিটিশ পুলিশদের ঘিরে ফেলে। ব্রিটিশ পুলিশ সরাসরি নানক ভীলের বুকে গুলি করে তাকে হত্যা করে। তাঁর স্মৃতিতে সেখানে মূর্তি স্থাপিত হয়েছে। সেখানে প্রতি বছর মেলা বসে।

জানো কি?

- আন্টার্কটিকা মহাদেশে একটিও দেশ নেই।
- চাঁদের ভর পৃথিবীর তুলনায় ৬ গুণ কম।
- আফগানিস্তানে ঘুড়ি ওড়ানো বেআইনি।
- ভারতে একমাত্র বেঙ্গালুরুতে ট্রেনের চাকা তৈরি হয়।।
- ক্যালকাটা থেকে কলকাতা নাম হয় ২০০১ সালে।
- WiFi থেকে ১০০ গুণ স্পিড বেশি Lifi-এর।
- সবচাইতে বেশি ম্যালেরিয়া হয় আফ্রিকায়।

ভালো কথা

রামুদের রাজহাঁস

রামুদের বারোটি রাজহাঁস আছে। ওরা আবার উড়তেও পারে। অচেনা কাছে গেলেই ঠোক্কর মারতে আসে। ওদের ভয় দেখালে তাড়া করে আসে। রামুদের বাড়ির কাউকে ঠোকর মারে না। রাস্তায় একদিন হাঁসগুলি ঘাস খাচ্ছিল, তখন ওপাড়ার একজন দুষ্ট লোক লাথি মেরেছিল। এমনি সবগুলি ছুটে এসে লম্বা গলা বাড়িয়ে লোকটির প্যান্ট ছিড়ে পালা ফালা করে দিয়েছিল। লোকটিও পালিয়ে বাঁচে। আমরা আনন্দে হাততালি দিচ্ছিলাম।

বিবেক মাহাত, চতুর্থ শ্রেণী, করদহ, দক্ষিণ দিনাজপুর।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

ঘুঘু

ঐন্দ্রি মহান্ত, দ্বিতীয় শ্রেণী, নুড়াইপাড়া, সিউড়ি, বীরভূম।

গ্রীষ্মকালের গরম দুপুর
তপ্ত বনছায়,
ক্লান্ত এক ঘুঘুপাখির
ডাক যে শোনা যায়।

মাছে মাঠে বনে বনে
ডাকছে ঘুরে ঘুরে
কেউ জানে না ডাকে কেন
অমন করুণ সুরে।

লেখা পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা ই-মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪

৯০৫১৭২১৪২০

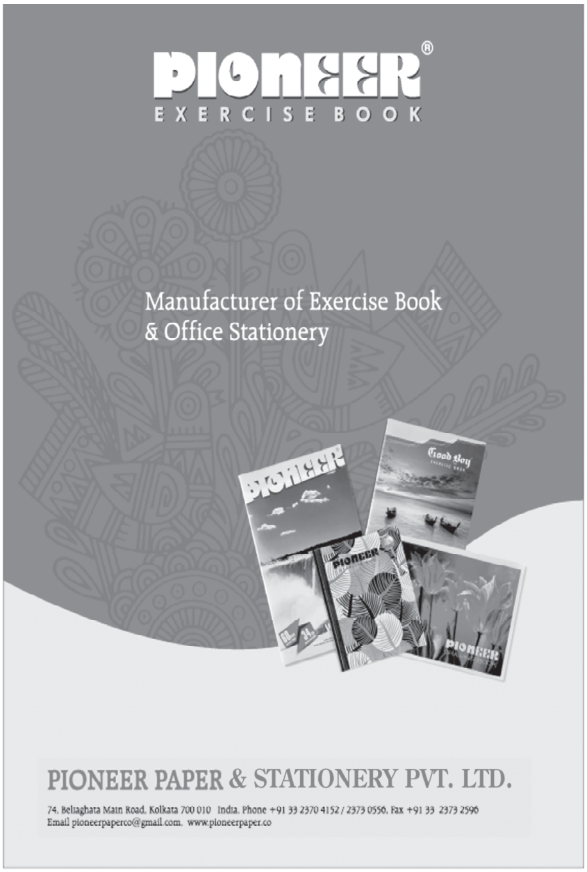

With Best Compliments from -

A

Well wisher

বাঙ্গালির বিপ্লব সাধনা

অংশুমান গঙ্গোপাধ্যায়

‘ওরা বীর, ওরা আকাশে জাগাতো ঝড়,
ওদের কাহিনী বিদেশির খুনে, গুলি বন্দুকে
বোমার আগুনে আজও রোমাঞ্চকর!
ওদের চেতনা শিরায় শিরায়, কে আছে আজিকে
ওদের ফিরায়, কে ভাবে ওদের পর?
ওরা বীর, ওরা আকাশে জাগাতো ঝড়!’

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের লেখা এই কবিতা ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙ্গালির আগ্নেয় প্রতিরোধের একটি নির্যাস যেন তুলে ধরে। মুক্তি সঙ্ঘ, অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর, প্রবর্তক আত্মোন্নতি, শ্রীসঙ্ঘ, বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স— এক একটি নাম যেন সাক্ষ্য রেখে যায় এক একটি অগ্নি স্ফুলিঙ্গের। ঋষি অরবিন্দ, অশ্বিনী কুমার দত্ত, বিপিনচন্দ্র পাল, প্রমথনাথ মিত্র, পুলিনবিহারী দাশ, উল্লাসকর দত্ত, বারীন্দ্রনাথ ঘোষ, যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (নিরালম্ব স্বামী), ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, বাঘা যতীন, রাসবিহারী বসু, যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র ঘোষ, অনুকূল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়, হরিদাস দত্ত, গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশ চন্দ্র মিত্র, ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, চিত্তরঞ্জন দাশ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র, বিপ্লবী চিন্তানায়ক অনিল রায়, দেশনেত্রী লীলা রায়, সুনীল দাশ, শচীন্দ্রনাথ সান্যাল, জ্যোতিষ জোয়ারদার— অবিরত, অনাবিল ভাবে দিয়ে গেছেন স্বদেশ মন্ত্র, জাগরণের অমোঘ বাণী, জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক আদর্শ ও রাষ্ট্রবাদী দর্শন।

‘ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেলো যাঁরা জীবনের জয়গান
আসি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে আজ দেবে কোন বলিদান!’

বন্দেমাতরম মন্ত্রের উদ্দীপ্ত সাধনায় বীরগতিপ্রাপ্ত হয়েছেন ক্ষুদিরাম বসু, প্রফুল্ল চাকী, বসন্ত বিশ্বাস, চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, কানাইলাল দত্ত, যতীন দাশ, অনাথবন্ধু পাঁজা, মৃগেন্দ্রনাথ দত্ত, জীবন ঘোষাল, রামকৃষ্ণ রায়, ব্রজকিশোর চক্রবর্তী, প্রদ্যোত ভট্টাচার্য, নির্মলজীবন ঘোষ, অনিল দাশ, তারকেশ্বর দস্তিদার, রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানকুমার বসুঠাকুর, লালমোহন সেন, প্রভাতাংশু পাল, বিনয় বসু, বাদল গুপ্ত, দীনেশচন্দ্র গুপ্তের মতো বঙ্গজননীর অসংখ্য দামাল সন্তান। স্বদেশ সাধনায় জীবন-যৌবন সমর্পণ করে, সর্বস্ব পণ করে ঝাঁপিয়ে পড়ে, কারাবরণ করে যাঁরা জীবনের অমৃত সময়কাল অতিবাহিত করলেন আন্দামানের সেলুলার জেল, প্রেসিডেন্সি ও অন্যান্য জেলের অভ্যন্তরে, সহ্য করলেন অকথ্য জেল যন্ত্রণা, তাঁদের স্মরণ করা, স্বদেশ ব্রতে বীর বিপ্লবীদের মহান আত্মত্যাগের ইতিহাস রচনার সময় এই স্বাধীনতা লাভের ৭৫ বছর পর আজ যেন উপনীত। বিপ্লবীদের জাতীয়তাবাদী আদর্শে ত্যাগ ও সমর্পণের মহান চেতনায় উদ্ভাসিত হোক আজকের নবীন প্রজন্ম। তাঁদের চিন্তাধারায় চালিত হয়ে গড়ে উঠুক আগামীদিনের ভারতবর্ষ।

‘ঘোররূপে মহারাবে’

গীতার কর্মযোগের আদর্শে দেশব্রতী বাঙ্গালি যুব সম্প্রদায়, শক্তিসাধনার চিরন্তন পরম্পরায় দীক্ষিত, ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক ও বাহক তরুণ বাঙ্গালি বিপ্লবীদের লড়াইয়ের বীরগাথা, সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে তাঁদের তরফে গড়ে তোলা প্রতিরোধের ঘটনাবলী ও আপোশহীন সংগ্রাম বাঙ্গালি সমাজের মানসক্ষেত্রে রেখে যায় এক তীব্র অনুরণন। কিংসফোর্ডের গাড়ি লক্ষ্য করে ক্ষুদিরাম বসু-প্রফুল্ল চাকীদের বোমাবর্ষণ, সত্যেন বসু-কানাইলাল দত্তদের জেলের মধ্যে পিস্তল জোগাড় করে বিশ্বাসঘাতক নরেন গোঁসাইকে সাজা দেওয়া, হেমচন্দ্র ঘোষ, অনুকূল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রডা কোম্পানির মাউজার অস্ত্র ভাণ্ডারের দখল, দিল্লির রাজপথে হার্ডিঞ্জকে লক্ষ্য করে বসন্ত বিশ্বাসের ছুঁড়ে দেওয়া বোমা, বুড়িবালামের তীরে যতীন্দ্রনাথ-নীরেন-চিত্তপ্রিয়- মনোরঞ্জনের মরণপণ সংগ্রাম, বিপ্লবীদের পক্ষে মেদিনীপুরের ৩ অত্যাচারী

ফঃ ৬

ম্যাজিস্ট্রেট ডগলাস-পেডি-বার্জকে নিকেশ করা, মাস্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল, জালালাবাদের মুক্তিযুদ্ধ, বা রাইটার্সের বিল্ডিংসের অভ্যন্তরে বিনয়-বাদল-দীনেশের অলিন্দ যুদ্ধ— অগ্নি অক্ষরে রক্ষিত ছিল, আছে, থাকবে বাঙ্গালির স্মৃতির মণিকোঠায়।

সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে সর্বস্বত্যাগী বিপ্লবীদের এই গৌরবগাথা যেন হয়ে আছে অমর ও চির অম্লান।

'চল রে চল সবে ভারত সন্তান
মাতৃভূমি করে আহ্বান!'

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মাতৃশক্তির অপরিসীম ভূমিকার অধ্যয়নও গুরুত্বপূর্ণ। দুকড়িবালা দেবী, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, মাতঙ্গিনী হাজরা— বাঙ্গালি নারী সমাজের কাছে চিরকালীন আদর্শ স্বরূপা। কুমিল্লার অত্যাচারী ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেন্সকে গুলি করা শান্তি ঘোষ-সুনীতি চৌধুরী, অ্যান্ডারসন হত্যা মামলায় কারাদণ্ড হওয়া উজ্জ্বলা মজুমদার বা ব্রিটিশ গভর্নর স্ট্যানলি জ্যাকসনকে হত্যার চেষ্টা করা বিপ্লবী বীণা দাশ মনে করিয়ে দিয়ে যান অন্যায় সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে বাঙ্গালি অগ্নিকন্যাদের নিরন্তর সংগ্রাম।

বেথুন কলেজে ইংরেজি অনার্সে গ্র্যাজুয়েট উত্তীর্ণ ও শীর্ষস্থানাধিকারী হয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে 'পদ্মাবতী মেডেল' প্রাপ্ত এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ইংরেজিতে প্রথম মহিলা স্নাতকোত্তর বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলাবতী নাগ (লীলা রায়) ১৯২৩ সালে স্থাপনা করেন এশিয়ার মধ্যে নারীসমাজের প্রথম সংগঠন— 'দীপালী সঙ্ঘ' এবং তারপরে 'নারীশিক্ষা মন্দির' সহ অসংখ্য স্কুল। তিনি ছিলেন পূর্ববঙ্গের বিপ্লবী সংগঠন শ্রীসঙ্ঘের বিপ্লবী নেত্রী। অক্লান্ত ভাবে তিনি নারী শিক্ষা প্রসার ও বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে একাত্মভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্রের একনিষ্ঠ অনুগামী। ১৯৩১ সালে মে মাসে ঢাকা শহরে তাঁর সম্পাদনায় আত্মপ্রকাশ করে জাতীয়তাবাদী মুখপত্র 'জয়শ্রী' পত্রিকা। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পত্রিকাটির জন্য আশীর্বাণী দান করেন—

'বিজয়িনী নাই তব ভয়,
দুঃখে ও বাধায় তব জয়।
অন্যায়ের অপমান,
সম্মান করিবে দান,
জয়শ্রীর এই পরিচয়।।'

'বাজলো তূর্য আকাশ পথে
সূর্য আসেন অগ্নি রথে!'

১৯৪২ সালের ১৭ ডিসেম্বর বিপ্লবী সতীশচন্দ্র সামন্ত, অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়, সুশীল কুমার ধাড়ার নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার। তৎকালীন মেদিনীপুর জেলায় গঠিত তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার ঘূর্ণিঝড় বিধ্বস্ত এলাকায় ত্রাণকার্য চালায়। ১৯৪৩ সালের জুন মাসে গ্রেফতার বরণের আগে পর্যন্ত সতীশচন্দ্র এই সরকার পরিচালনা করেছিলেন। ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত সফলভাবে কাজ করেছিল পরাধীন ভারতের মধ্যে স্বাধীনতা ঘোষণা করে, বিপ্লবীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালত তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার।

'জাগো দুর্গা জাগো দশপ্রহরণধারিণী'

বিপ্লবী অতীন্দ্রনাথ বসুর নেতৃত্বে সিমলা ব্যায়াম সমিতির দুর্গাপূজা, সুভাষচন্দ্রের সভাপতিত্বে বাগবাজার সার্বজনীন দুর্গাপূজা, পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রিটের কালীপূজা, বা গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বৌবাজারের কাছে মলঙ্গা লেনে জাতীয় আর্ত ত্রাণ সমিতির দুর্গাপূজা, পরবর্তী কালে বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা রায়ের অংশগ্রহণে বালিগঞ্জে সমাজসেবী সঙ্ঘের দুর্গাপূজা ছিল বাঙ্গালি বিপ্লবীদের শক্তি সাধনার অন্যতম মাধ্যম। এই শক্তিসাধনা মহাষ্টমী তিথিতে উদ্‌যাপিত বীরাষ্টমী ব্রত ছিল অদম্য লড়াইয়ের লক্ষ্যে, আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ বিপ্লবীদের সিংহ হৃদয়ে অপরিসীম ও অনন্ত শক্তির উৎস। দুর্গাপূজা ছিল তেজদৃপ্ত বীর বিপ্লবীদের দেশাত্মবোধক সাধনা। ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট, কলকাতার বুকে জেহাদি জল্লাদ বাহিনীর ডাইরেক্ট অ্যাকশন শুরু হওয়ার পর বিপ্লবী বীর গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে গঠিত 'ভারতীয় জাতীয় বাহিনী'র সদস্য যুগল কিশোর ঘোষ, বিজয় সিংহ নাহার, রাম চট্টোপাধ্যায়দের পালটা প্রতিরোধ রচনা করেছিল জিন্নার মুখে ছাই দিয়ে পাকিস্তান থেকে ছিনিয়ে নিয়ে, ভারতের সাংস্কৃতিক পীঠ কলকাতাকে ভারতের বুকে ধরে রাখার ইতিহাস।

'যাঁরা স্বর্গগত তাঁরা এখনও জানে
স্বর্গের চেয়ে প্রিয় জন্মভূমি!'

স্বদেশ মুক্তির লক্ষ্যে বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসুর পরিকল্পনায়, সর্বাধিনায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে ১৯৪৩ সালে শপথ গ্রহণ করা 'দ্য প্রভিশনাল গভর্নমেন্ট অব ফ্রি ইন্ডিয়া ইন এক্সাইল' বা আজাদ হিন্দ সরকারের দ্বারা গঠিত ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি বা আজাদ হিন্দ ফৌজের ব্রিটিশ রাজ তথা ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে তীব্র রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম, রানি ঝাঁসি রেজিমেন্টের লড়াই, যুদ্ধক্ষেত্রে ২৬ হাজার আজাদী সেনার বলিদান, যুদ্ধ শেষের পরে বারাসাত- নীলগঞ্জ-ঝিকরগাছায় সেনাশিবিরে যুদ্ধবন্দী আজাদী সেনাদের গণহত্যার ইতিহাস স্বাধীনতার এই অমৃতকালে স্মরণ-মনন এবং স্বদেশ চেতনার মন্ত্রে জাগ্রত, উন্নত ভারতবর্ষ নির্মাণ ভারতবাসীর সংকল্প হোক। □

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার যে সকল বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদ শেষ হয়েছে বা শেষ হতে চলেছে তাঁদের কাছে বিনীত নিবেদন, আপনারা পরবর্তী বছরের জন্য গ্রাহকমূল্য ৭০০ টাকা অবিলম্বে জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণের মাধ্যমে আমাদের সহযোগিতা করুন। স্বস্তিকার প্রতিনিধির মাধ্যমেও টাকা পাঠাতে পারেন।

নতুন গ্রাহক হলে সম্পূর্ণ নাম-ঠিকানা, ফোন নম্বর (পিন কোড সহ) অবশ্যই পাঠাবেন।

ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

রামমন্দির : ভারতবাসীর দীর্ঘদিনের স্বপ্নপূরণ

তরুণকুমার পণ্ডিত

দীর্ঘ ৫০০ বছরের প্রতীক্ষার অবসান। আগামী ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় নবনির্মিত শ্রীরাম মন্দিরের গর্ভগৃহে রামলালা মূর্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে। সারাদেশ ও বিদেশের কয়েক হাজার বিভিন্ন পন্থের সাধু, সন্ন্যাসী, দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবতও সেই মনোরম ও ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী হিসেবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন।

ধর্মপ্রাণ দেশ আমাদের ভারত। এখানে জন্মগ্রহণ করে অনেক অবতার ও মহাপুরুষ কেবল এই দেশ ও দেশবাসীকেই গর্বিত করেননি, বরং নিজেই ধন্য হয়েছেন। এমনই একজন মহামানব ছিলেন মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র। মহর্ষি বাল্মীকির প্রথম সংস্কৃত রামায়ণের পর পৃথিবীর প্রায় সমস্ত প্রধান ভাষায় শ্রীরামচন্দ্রের মহিমা, গান লিপিবদ্ধ হয়েছে। হাজার হাজার বছর ধরে কোটি কোটি মানুষ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সঙ্গে শ্রীরামকথা শ্রবণ করেছে, শ্রীরামচন্দ্রকে পূজা করছে। ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে যেখানে মৌলিক অধিকারের উল্লেখ রয়েছে, তার একেবারে উপরে শ্রীরামচন্দ্র, মাতা সীতা ও লক্ষ্মণের চিত্র অঙ্কিত রয়েছে। এসবের মাধ্যমেই প্রমাণিত হয়, শ্রীরামচন্দ্রই ভারতের আত্মা। সম্প্রতি মুম্বইয়ে দীপাবলীর এক অনুষ্ঠানে প্রবীণ গীতিকার জাভেদ আখতারের বক্তব্যে উঠে আসে মা সীতার প্রসঙ্গ। তিনি বলেন, 'ভগবান রাম ও মাতা সীতার দেশে জন্ম নিয়ে আমি গর্বিত। নাস্তিক হলেও আমি শ্রীরাম ও সীতামাতাকে দেশের সম্পদ বলে মনে করি এবং রামায়ণ আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য।' দীপাবলীর ওই অনুষ্ঠানে তিনি 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনিও তোলেন। ভগবান শ্রীরাম সম্পর্কে তিনি আরও বলেন, 'মর্যাদা পুরুষোত্তম কথাটি উচ্চারিত হলে সবার আগে শ্রীরামের কথাই আমার মনে আসে।' অথচ আশ্চর্যজনক ভাবে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি শুনে রেগে যান।

মনে রাখতে হবে, অযোধ্যায় অনেক মসজিদ আছে, কিন্তু বিশ্বে রাম জন্মভূমি একটাই। আজ শ্রীরামজন্মভূমি উদ্ধারের সেই গৌরবোজ্জ্বল সংগ্রাম ও সংঘর্ষের ইতিহাস পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। ত্রেতাযুগে পবিত্র সরযূনদীর তীরে অবস্থিত অযোধ্যা নগরীতে শ্রীরামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। স্মরণাতীতকাল থেকেই ভারতবাসী অযোধ্যাকে মোক্ষনগরী বলে মেনে এসেছে। শান্তি ও সম্পদে পরিপূর্ণ ভারতের ওপর ইসলামি আক্রমণ ৭১২ খ্রিস্টাব্দে শুরু হয়েছিল। বাবর ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে ভারতে ও ১৫২৮ খ্রিস্টাব্দে অযোধ্যায় হামলা করেছিল। বাবরের আদেশে তার সেনাপতি মির বাঁকি রামমন্দিরের ওপর আক্রমণ করে। ১৫ দিন ভয়াবহ যুদ্ধের পর তোপ দেগে মন্দির ধ্বংস করা হয়েছিল।

এই যুদ্ধে ১ লক্ষ ৭৪ হাজার বীর হিন্দু প্রাণ বলিদান করেন। দরবেশ মুসা আশিকানের নির্দেশে মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দিয়ে সেখানেই একটি মসজিদের আকৃতি সৌধ নির্মিত হয়েছিল। হিন্দুদের লাগাতার প্রতিরোধের মধ্যে তাড়াতাড়ি কাজ করতে গিয়ে মসজিদের জন্য যেগুলি অনিবার্য, সেই মিনার ও নমাজের আগে হাত-পা ধোয়ার

(ওজু) স্থান তৈরি করা সম্ভব হয়নি। এরপরেও কিন্তু মন্দির ফিরে পাওয়ার চেষ্টায় ছেদ পড়েনি।

ইতিহাসে ১৫২৮ থেকে ১৯৪৯ পর্যন্ত মন্দির উদ্ধারের জন্য ৭৬ বার যুদ্ধের ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। রাজা থেকে সন্ন্যাসী, সাধারণ মানুষ এই যুদ্ধগুলিতে যোগ দিয়েছিলেন। মন্দির উদ্ধারকাজে প্রাণ বলিদানের জন্য হিন্দু মাতৃশক্তিও এগিয়ে এসেছিল। এই সংঘর্ষের মধ্যেই কিছু সমঝোতার কারণে মন্দির প্রাঙ্গণে 'রাম চবুতরা'-য় হিন্দুরা পূজাপাঠ শুরু করেন। পরিক্রমা চলতে থাকে। ১৯৩৪ সালে বৈরাগীদের দ্বারা শেষ বড়ো সংঘর্ষের পর আর কখনও ওই স্থানে নমাজ পড়া হয়নি। উল্লেখ্য, ১৮৫৭ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের পর সর্দার আমির আলির নেতৃত্বে স্থানীয় মুসলমান সমাজ ওই স্থানটি ছেড়ে দিতে রাজি হয়। বাবা রাঘব দাস হিন্দুদের প্রতিনিধি হিসেবে মুসলমানদের সঙ্গে কথা বলেন। কিন্তু চতুর ইংরেজ হিন্দু-মুসলমান লড়াই স্থায়ী করার চক্রান্তে ওই দু'জনকেই ফাঁসি দেয়। সমস্যা সমাধানের চেষ্টা এখানেই থেমে গিয়েছিল।

তারপর ১৯৪৯ সালের ২৩ ডিসেম্বরে যখন রামভক্তরা ওই সৌধের মধ্যে রামচন্দ্রের পূজা-অর্চনা শুরু করেন, তখন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু মূর্তি সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। কিন্তু প্রবল জনবিক্ষোভের ভয়ে উত্তরপ্রদেশের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী গোবিন্দবল্লভ পন্থ তা করতে রাজি হননি। জেলাশাসক নায়ার মন্দিরে তালা লাগিয়ে দেন এবং প্রশাসনের পক্ষ থেকে পূজারি নিয়োগ করে নিত্যপূজা ও ভোগ-রাগের ব্যবস্থা করেন। তারপর দীর্ঘ ৩৩ বছর ছোটোখাটো আন্দোলন চালিয়ে গিয়েছে হিন্দু সমাজ। ১৯৮৩ সালে উত্তরপ্রদেশের মুজফ্ফর নগরে অনুষ্ঠিত বিশাল হিন্দু সম্মেলনে দু'জন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা প্রাক্তন উপপ্রধানমন্ত্রী গুলজারিলাল নন্দা এবং উত্তরপ্রদেশে প্রাক্তন মন্ত্রী দাউদয়াল খান্না কেন্দ্র সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছিলেন, সংসদে আইন পাশ করে অযোধ্যার শ্রীরামজন্মভূমি, মথুরার শ্রীকৃষ্ণ জন্মভূমি এবং কাশীর বিশ্বনাথ মন্দির হিন্দুদের হাতে তুলে দেওয়া হোক, যাতে দেশে স্থায়ী শান্তি আসতে পারে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার সেকথায় কর্ণপাত করেনি।

এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তৈরি 'শ্রীরাম জন্মভূমি মুক্তিযজ্ঞ সমিতি'র নামে আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৮৪ সালের অক্টোবর মাসে 'শ্রীরাম জানকী রথ' যাত্রার মাধ্যমে শুরু হয় জনজাগরণ। প্রথমেই রামলালাকে তালামুক্ত করার দাবি জানানো হয়। জন-আন্দোলনের চাপে সরকার ১৯৮৬ সালের ১ ফেব্রুয়ারি তালা খুলে দেয়। এরপরেই হিন্দু সমাজের সমস্ত মত ও পথের ধর্মগুরু মিলে গঠন করেন 'শ্রীরাম জন্মভূমি ন্যাস'। ১৯৮৯ সালের জুলাইয়ে এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি দেবকীনন্দন আগরওয়াল আদালতের কাছে বিতর্কিত সম্পূর্ণ পরিসর রামলালার সম্পত্তি হিসেবে ঘোষণা করার আবেদন জানান। আদালত সমস্ত বিবাদ লখনউ বেঞ্চে পাঠিয়ে দেয়। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের অগ্রণী ভূমিকার কারণে এই অভিযান জন-আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করে। ১৯৮৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারতের গ্রাম ও শহরের ২ লক্ষ ৭৫ হাজার স্থানে শ্রীরাম শিলা পূজা অনুষ্ঠিত হয়। ৬ কোটি ২৫ লক্ষ মানুষ তাতে অংশগ্রহণ করেন। বিদেশে বসবাসকারী হিন্দুরাও শিলাপূজন করে তা ভারতে পাঠান। প্রবল জন-আন্দোলনের কারণে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার নতি স্বীকার করে। ১৯৯০ সালে শুরু হয় করসেবা। জুন, ১৯৯০ সালে হরিদ্বারে অনুষ্ঠিত হিন্দু সম্মেলনে পূজ্য সন্ত ও ধর্মাচার্যরা মন্দির নির্মাণের জন্য 'করসেবা'র ডাক দেন। ৩০ অক্টোবর উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মুলায়ম সিংহের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে কসরেবকরা গম্বুজের উপর গৈরিক পতাকা উড়িয়ে দেন। এর বদলা নিতে ২ নভেম্বর, ১৯৯০-এ শান্ত করসেবকদের ওপর গুলি চালানো হয়। পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা থেকে দুই ভাই রাম কোঠারি ও শরদ কোঠারি সেই গুলিতে নিহত হন। নিহত হন অন্যান্য প্রদেশের বেশ কিছু করসেবক। ভয়ংকর এই নরসংহারে সমস্ত দেশ কেঁপে ওঠে। ক্ষমতা থেকে সরে যেতে হয় মুলায়ম সিংহকে। নির্বাচনে কল্যাণ সিংহের নেতৃত্বে উত্তরপ্রদেশের বিজেপির সরকার গঠিত হয়, যা মন্দির নির্মাণের লক্ষ্যে আরও একটি অগ্রণী পদক্ষেপ। তীর্থযাত্রীদের সুবিধার জন্য উত্তরপ্রদেশ সরকার বিতর্কিত স্থানের পাশেই ২.২৭ একর জমি অধিগ্রহণ করে। ওই জমি সমতল করার সময় জমির নীচ থেকে অনেক ভগ্নমূর্তি ও মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বেরিয়ে আসে। এরপরের ঘটনায় সারাদেশ ও বিদেশে প্রচণ্ড আলোড়ন তৈরি হয়।

১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর ২ লক্ষ করসেবকের উপস্থিতিতে অযোধ্যার বাবরি ধাঁচা ধূলিসাৎ হয়ে যায়। ফলস্বরূপ সারাদেশে অশান্তি তৈরি হয়, দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে ও কয়েক হাজার মানুষের মৃত্যু হয়। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এরপর ২০১০ সালে শ্রীরামজন্মভূমি মন্দির নির্মাণ সমিতি রামমন্দির নির্মাণ নিয়ে পুনরায় সংকল্প গ্রহণ করে এবং হনুমৎ শক্তির জাগরণ কার্যক্রমের ঘোষণা করে। এলাহাবাদ হাইকোর্ট রামমন্দিরের পক্ষে আংশিক রায় দিলে সেই মামলা সুপ্রিম কোর্টে যায়। অবশেষে ২০১৯ সালের ৯ নভেম্বর সুপ্রিম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়ে বিতর্কিত শ্রীরামজন্মভূমিতেই মন্দির নির্মাণের কথা বলা হয়। শ্রীরাম জন্মভূমি আন্দোলনের ইতিহাস ও তা পরিণতি আরও একবার প্রমাণ করল, হিন্দু পুনর্জাগরণ ও তার সংহতি ক্ষমতার উৎস। মন্দির নির্মাণ এবং শ্রীরামচন্দ্রের প্রাণ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সকল মত-পথ ও উপাসনার অনুগামীদের সদ্ভাব নির্মাণ হবে। দেশের প্রগতি দ্রুত হবে এবং ভারতে রামরাজ্যের কল্পনা বাস্তবায়িত হয়ে রাষ্ট্র নির্মাণের পথে আর এক ধাপ অগ্রসর হবে। আজ কোটি কোটি মানুষের বহু আকাঙ্ক্ষিত যে শ্রীরামচন্দ্রের বিশাল রমণীয় মন্দির তৈরি হচ্ছে, সেটি দেখতে কেমন হবে, অনেকেই তা জানতে আগ্রহী। মন্দিরটি লম্বায় ৩৮০ ফুট, তিনতলা ওই ভব্য মন্দিরের প্রত্যেক তলার উচ্চতা ২০ ফুট। নবনির্মিত রামমন্দিরে মোট ৩৯২টি স্তম্ভ এবং ৪৪টি দরজা থাকছে। আর ভূতলের গর্ভগৃহে প্রভু শ্রীরামলালার বিগ্রহ থাকবে। এছাড়াও শারীরিক দিক থেকে অক্ষম ও বৃদ্ধ দর্শনার্থীদের জন্য মন্দিরে লিফট ও অন্য ব্যবস্থা থাকবে। এককথায়, অযোধ্যায় ভব্য শ্রীরাম মন্দিরের গর্ভগৃহে রামলালা মূর্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠায় দেশের মানুষের দীর্ঘদিনের স্বপ্নপূরণ হচ্ছে।

(সৌজন্যে যুগশঙ্খ)

পাকিস্তানে ধ্বংস সতীপীঠ

দুলালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ওরফে অবধূতের বিখ্যাত উপন্যাস 'মরুতীর্থ হিংলাজ' অবলম্বনে পশ্চিমবঙ্গে চলচ্চিত্রও হয়েছিল, তাতে উত্তমকুমার, বিকাশ রায়, পাহাড়ি সান্যাল প্রমুখের অসাধারণ অভিনয়ের কথা বাঙ্গালি জীবনেও বিস্মৃত হবে না। চলচ্চিত্র ছেড়ে ইতিহাসে ফেরা যাক। হিংলাজ যাত্রা হলো পাকিস্তানে সর্ববৃহৎ হিন্দু তীর্থযাত্রা। মার্চ মাস নাগাদ এই যাত্রায় আড়াই লক্ষেরও বেশি হিন্দু অংশগ্রহণ করেন।

হিংলাজ মাতার মন্দির হিন্দুধর্মের, মূলত শাক্তদের কাছে পবিত্র একান্ন শক্তিপীঠের এবং পাকিস্তানে অবস্থিত তিনটি শক্তিপীঠের অন্যতম। পাকিস্তানের অপর দুটি শক্তিপীঠ হলো সারদা পীঠ ও শিবহরকরায়। হিঙ্গোল নদীর তীরে একটি পার্বত্য গুহায় দেবী দুর্গার বিশেষ রূপ হিসেবে হিংলাজমাতার পূজাবেদীটি অবস্থিত। পাকিস্তানের বালোচিস্তান প্রদেশের লাসবেলা জেলায় মাকরান উপকূলে অবস্থিত হিংলাজ শহরে এই ঐতিহাসিক মন্দির অবস্থিত। হিন্দুদের কাছে অতি পবিত্র ও ঐতিহ্যমণ্ডিত এই তীর্থস্থান আর দেখতে পাবেন না পৃথিবীর মানুষ। কারণ আদালতের একটি সিদ্ধান্তকে খাড়া করে তার অজুহাতে সিন্ধু প্রদেশের থারপারকার জেলায় মিথি শহরের হিন্দুদের পবিত্র তীর্থস্থান সেই হিংলাজমাতার মন্দির এবার বুলডোজার চালিয়ে ভেঙে দিল পাক-প্রশাসন। পাশাপাশি নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর আরও একটি সতীপীঠ, হিন্দু মন্দির সারদা পীঠ মন্দিরও ধ্বংস করা হয়েছে। মন্দিরের সুরক্ষার জন্য সেদেশের সর্বোচ্চ আদালতের একটি স্থায়ী রায় সত্ত্বেও এই হিন্দু-বিরোধী পদক্ষেপটি নেওয়া হয়েছে বলে সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর পাওয়া যাচ্ছে। উল্লেখনীয় যে, মন্দিরটি রাষ্ট্রসঙ্ঘের শিক্ষাগত, বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থা ইউনেস্কোর হেরিটেজ সাইট হিসেবে স্বীকৃত, কিন্তু তা সত্ত্বেও পাক-সরকার এলাকাটি সুরক্ষা জন্য এতদিন কোনো উদ্যোগই নেয়নি।

সংবাদমধ্যমের প্রতিবেদনে প্রকাশ, ধর্মীয় স্থানটির পাশে একটি কফি শপ স্থাপিত হবে, যেটি এবছরেই খোলার পরিকল্পনা করা হয়েছে। সারদা পীঠের বিরুদ্ধে পদক্ষেপটি এই অঞ্চলের ঐতিহ্যশালী সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় উত্তরাধিকার সংরক্ষণের পাশাপাশি বৈশ্বিক সংরক্ষণ উদ্যোগেরও বিপরীতমুখী পদক্ষেপ বলে তথ্যভিজ্ঞ মহলের দাবি। হিংলাজমাতা স্থানীয় ভাবে হিংলাজ দেবী, হিঙ্গুলা দেবী এবং নদী মন্দির নামেও পরিচিত। সারদা পীঠ পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের রাজধানী মুজাফ্ফরাবাদ থেকে প্রায় ১৫০ কিলোমিটার এবং ভারতের জম্মু-কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর থেকে ১৩০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এটি নিয়ন্ত্রণ রেখা থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে, যা জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন রাজকীয় রাজ্যকে বিভক্ত করে। এটি হারমুখ পর্বতের উপত্যকা সারদা গ্রামে নীলম নদীর ধারে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১,৯৮১ মিটার উপরে অবস্থিত এবং কাশ্মীরি পণ্ডিতরা এটিকে ভগবান শিবের আবাস বলে বিশ্বাস করেন।

হিংলাজ যাত্রা পাকিস্তানের বৃহত্তম হিন্দু তীর্থযাত্রা। মার্চ মাসে হিংলাজ যাত্রায় আড়াই লক্ষেরও বেশি পুণ্যার্থী অংশ নেয়। হিন্দুদের এই পবিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ মন্দিটি ভেঙে ফেলায় স্থানীয় সনাতনীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। মন্দিরের সামনে জড়ো হয়ে স্থানীয় হিন্দুরা 'জয় মাতাদি' এবং 'হিন্দু ধর্ম জয়' স্লোগান দেয়। একান্ন সতীপীঠের মধ্যে দেশভাগের কারণে তিনটি শক্তিপীঠ পাকিস্তানে পড়েছিল। এতদিন সেদেশে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার সত্ত্বেও শক্তিপীঠগুলো অন্তত তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছিল। আসলে এগুলো শুধু হিন্দুদের পবিত্র তীর্থস্থান হিসেবেই নয়, পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের ঐক্যবদ্ধ করার কাজটাও করতো। এর মধ্যে দুটি গেল, অন্যটি রক্ষায় আন্তর্জাতিক দুনিয়া এগিয়ে না এলে, সে দেশের কথা না হয় বাদই দেওযা গেল, বিশ্বের মানবতাও ভূলুণ্ঠিত হবে।

পরলোকে তরুণ কুমার পণ্ডিত

গত ২৬ নভেম্বর মর্মান্তিক পথদুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন মালদহের কাঞ্চনতার শাখার স্বয়ংসেবক তথা উত্তরবঙ্গ সহপ্রান্ত কার্যবাহ তরুণ কুমার পণ্ডিত। সেদিন বিকেলে মালদহের অতুল মার্কেটে বিদ্যার্থী পরিষদের একটি বৈঠকে যোগদানের পর স্কুটিতে বাড়ি ফিরছিলেন। রাস্তায় দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার দু'ঘণ্টা পর তাঁর প্রাণবায়ু নির্গত হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬২ বছর। রেখে গেলেন দুই পুত্র-সহ অসংখ্য গুণমুগ্ধ স্বয়ংসেবক ও বন্ধু-বান্ধব। তাঁর দুই পুত্রই স্বয়ংসেবক। বড়ো পুত্র মালদহ জেলা সহ বৌদ্ধিক প্রমুখের দায়িত্ব পালন করছেন।

তরুণদা এলাকায় 'বড়দা' নামে পরিচিত ছিলেন। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। দলমত নির্বিশেষে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানযের সঙ্গে যেমন তাঁর সুসম্পর্ক ছিল, তেমনই বিভিন্ন সামাজিক কাজের সঙ্গেও সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। সমাজ বিরোধীদের হাত থেকে স্থানীয় পাতালচণ্ডী মন্দিরের জমি উদ্ধার, মন্দির নির্মাণ এবং মন্দিরকে কেন্দ্র করে এলাকার মানুযের মধ্যে ভক্তিভাবের বিস্তার, এসবই তরুণদার উল্লেযোগ্য কীর্তি। কয়েক মাস আগে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত সঙ্ঘের সেবা বিভাগের পক্ষ থেকে তাঁকে এই কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ সঙ্ঘের পূর্বতন সরকার্যবাহ ভাইয়াজী যোশী সম্মানিত করেন।

১৯৭৮ সালে তৎকালীন মালদহ জেলা প্রচারক সুধাময় দত্তের হাত ধরে তিনি স্বয়ংসেবক হন। কাঞ্চনতার শাখা ধীরে ধীরে এলাকার আশা ভরসার কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। মিতভাষী ও মিষ্টভাষী তরুণদার নেতৃত্বে গ্রামের সমস্ত বাড়ির প্রতিনিধিত্ব শাখায় হতে থাকে। তিনি অজাতশত্রু ছিলেন।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি একটি উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। ছাত্রপ্রিয় শিক্ষক হিসেবে এলাকায় পরিচিত ছিলেন। তাঁরই উদ্যোগে পাশে পার্বত্যা গ্রামে সঙ্ঘের শাখা শুরু হয়। শাখাটি জেলার মধ্যে প্রথম সারির শাখারূপে বর্তমানে চিহ্নিত।

স্বস্তিকা পত্রিকার প্রচার-প্রসারেও তাঁর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি সরকারি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সাংবাদিক ছিলেন। ছিলেন সুলেখক। যুগশঙ্খ ও স্বস্তিকা পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। তাঁর অকাল প্রয়াণে সমাজ ও সঙ্ঘ এক কর্মযোগীকে হারাল। গত ২৭ নভেম্বর তাঁর শেষযাত্রায় হাজার হাজার মানুষ তাঁকে চোখের জলে বিদায় জানায়। সাদুল্লাপুর মহাশ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

হালাল সার্টিফায়েড পণ্য বিক্রি নিষিদ্ধ করলো উত্তরপ্রদেশ সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ হালাল লেখা পণ্যের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হলো উত্তরপ্রদেশ সরকারের। ইসলামে যেসব পণ্য ব্যবহার বা খাবারের অনুমতি রয়েছে তাকেই প্রধানত বলা হয় হালাল খাবার বা পণ্য। সেই ধরনের পণ্য এবার নিষিদ্ধ করলো যোগী আদিত্যনাথের সরকার। কিছু তেল, সাবান, টুথপেস্টের মতো পণ্য হালাল সার্টিফায়েড বলে বিক্রি করা হয় উত্তরপ্রদেশ সহ গোটা দেশে। গত ১৮ নভেম্বর একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে সেই হালাল পণ্য বিক্রি নিষিদ্ধ করলো উত্তরপ্রদেশ সরকার।

হালাল পণ্য বিক্রির বিরুদ্ধে সম্প্রতি একটি এফআইআর দায়ের করা হয় লক্ষ্ণৌ কমিশনারেটে। অভিযোগ উঠেছে হালাল ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড, জমিয়ত-উলেমা-এ-হিন্দ, হালাল ট্রাস্ট, হালাল কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া সহ একাধিক সংগঠনের বিরুদ্ধে। শৈলেন শর্মা নামে এক ব্যক্তি ওই এফআইআর দায়ের করেন। তাঁর অভিযোগ, ওইসব সংগঠনের কোনো অধিকার নেই কোনো পণ্যকে হালাল সার্টিফিকেট দেওয়ার। এরা বিশেষ এক ধর্মের মানুষকে বিশেষ পণ্য বিক্রির ব্যাপারে উৎসাহ দিচ্ছে। ওইসব সার্টিফিকেট দিয়ে তারা বিপুল অর্থ আয় করছে। এর মধ্যে গভীর ষড়যন্ত্র রয়েছে। ওই টাকা ব্যবহৃত হচ্ছে দেশবিরোধী কার্যকলাপেও।

উত্তরপ্রদেশ সরকারের এক মুখপাত্র বলেন, ওইসব পণ্যের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছেন যোগী আদিত্যনাথ। হালাল সার্টিফিকেট দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করছে। আর এর থেকে সংগৃহীত হওয়া সম্পদ দেশবিরোধী কার্যকলাপে ব্যবহার করা হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে। এর ফলে দেশের বিভিন্ন কোম্পানির ক্ষতি হচ্ছে।

ভারতের জিডিপি অতিক্রম করলো ৪ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ১৯ নভেম্বর দিনটি হয়ে উঠলো ঐতিহাসিক। ইতিহাসে প্রথম বার ভারতের জিডিপি (গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট) ৪ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি হতে দেখা গেল। এর ফলে জিডিপির নিরিখে আমেরিকা, চীন, জাপান ও জার্মানির পরে চলে এলো ভারত।

২০২৪ সালের মধ্যে ভারতের জিডিপি ৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। আর এই সাফল্য সেই লক্ষ্য অর্জনের পথে অন্যতম মাইল ফলক বলে মনে করছেন অর্থনীতিবিদরা। ভারতের শক্তিশালী অর্থনৈতিক বৃদ্ধি একটি আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে ভারতের উত্থানের প্রতিফলন বলেই মনে করা হচ্ছে।

সামাজিক মাধ্যমে (সোশ্যাল মিডিয়ায়) এই সাফল্যে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে অনেকেই আইএমএফ (ইন্টারন্যাশনাল মানিটারি ফান্ড) হতে সংগৃহীত তথ্যসমৃদ্ধ অনলাইন (লাইভ) জিডিপি ট্র্যাকারের স্ক্রিনশট শেয়ার করেছেন।

ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেছেন তারা। আরবিআই (রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া)-এর অনুমান, চলতি অর্থ বর্ষের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে ভারতের জিডিপি বৃদ্ধি হবে ৬.৫ শতাংশ। তবে বহু সংস্থার অর্থনৈতিক পূর্বাভাসে দাবি করা হয়েছে, বৃদ্ধির পরিমাণ আরবিআই-এর অনুমানের থেকে বেশি হবে। এই আর্থিক বর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকে ভারতের জিডিপি বৃদ্ধি ঘটেছিল ৭.৮ শতাংশ।

আরবিআই গভর্নর শক্তিকান্ত দাস সম্প্রতি বলেছেন বলেছেন, 'অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের গতিবেগ দেখে আমি আশা করছি দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে জিডিপি বৃদ্ধি আমাদের অবাক করে দিতে পারে'।

ব্যাংককে অনুষ্ঠিত হলো বিশ্ব হিন্দু সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ প্রগতিশীল ও প্রতিভাবান সমাজ রূপে হিন্দুদের বিশ্বজনীন পরিচয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গত ২৪-২৬ নভেম্বর, থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে অনুষ্ঠিত হলো 'থার্ড ওয়ার্ল্ড হিন্দু কংগ্রেস' বা 'তৃতীয় বিশ্ব হিন্দু সম্মেলন'। সনাতন ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ ও বিরূপ প্রবণতার বিরুদ্ধে সার্বিক প্রতিরোধ এবং হিন্দু সংগঠন সমূহের অভ্যন্তরে শক্তিশালী ঐক্য বিধানের সংকল্প এই সম্মেলনে গৃহীত হয়। এই সম্মেলনের বিভিন্ন সত্রে— বিভিন্ন সংগঠনকে একজোট করে, তাদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সমন্বয় সাধন করে, বিশ্বব্যাপী হিন্দু বিরোধী ন্যারেটিভের মোকাবিলায় বিভিন্ন দেশের সাধারণ নির্বাচনে হিন্দু জনপ্রতিনিধিদের জয়যুক্ত করার লক্ষ্যে প্রস্তাবনা সম্মেলনে আগত প্রতিনিধিদের দ্বারা গৃহীত হয়। বিশ্বের ৬১টি দেশ হতে ২,১০০ জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

২৪ নভেম্বর ধর্মের বিজয় ঘোষণাপূর্বক প্রদীপ প্রজ্বলন করে এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন বিশ্ব হিন্দু কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী, মাতা অমৃতানন্দময়ী দেবী, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক ডাঃ মোহনরাও ভাগবত, সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবলে এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আন্তর্জাতিক সাধারণ সম্পাদক মিলিন্দ পরাণ্ডে। মোহনজীর উদ্বোধনী অভিভাষণ দিয়ে সম্মেলনের প্রথম দিনের প্রথম সত্রের শুভ সূচনা হয়। তাঁর ভাষণের বিষয়বস্তু ছিল— 'জয়স্য আয়াত্নাম্ ধর্মঃ', অর্থাৎ বিজয় প্রাপ্তির লক্ষ্যে ধর্মের প্রধান ভূমিকা। এই বিষয়ে তাঁর উপলব্ধির ব্যাখ্যার মাধ্যমে সঞ্চারিত অনুপ্রেরণা ও নির্দেশনার দ্বারা বিশ্ব হিন্দু সম্মেলনের শুভ সূচনা হয়।

ভবিষ্যতে ভারত সমগ্র বিশ্বের পথনির্দেশক হয়ে উঠবে বলে মোহনজী উল্লেখ করেন। সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন বিশ্ব হিন্দু কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী, স্বামী মিত্রানন্দজী, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবলে, বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রী, কর্পোরেট ব্যক্তিত্ব টি.ভি. মোহনদাস পাই, অধ্যাপক ড. আনন্দ রঙ্গনাথন। বিশ্বজনীন ধর্ম ও মানব সভ্যতার সংকট এবং অধুনা উপস্থিত অসংখ্য চ্যালেঞ্জের বিষয়ে বক্তারা আলোকপাত করে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ ছাড়াও, সম্ভাব্য সমাধানের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ মতামত ব্যক্ত করেন। সম্মেলনের শেষ দিনে সমাপ্তি ভাষণ দান করেন মাতা অমৃতানন্দময়ী। পরবর্তী বিশ্ব হিন্দু সম্মেলন ২০২৬ সালের ১৮-২০ ডিসেম্বর, মুম্বইতে অনুষ্ঠিত হবে বলে ঘোষণা করেন বিশ্ব হিন্দু সম্মেলনের আয়োজক সমিতির সচিব স্বদেশ খেতাওয়াত।

ব্যাংককে বিশ্ব হিন্দু সম্মেলনের আয়োজনের কারণে থাইল্যান্ড সম্মানিত বলে উল্লেখ করে থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী শ্রেথা থাভিসিন— হিন্দু জীবন দর্শন ও মূল্যবোধের অপরিসীম গুরুত্বকে তুলে ধরে এই মহতী সম্মেলনে তাঁর বার্তা প্রেরণ করেন। তাঁর প্রেরিত বার্তাটি সম্মেলনে পাঠ করা হয়। অহিংসা, সত্য, সহিষ্ণুতা ও সম্প্রীতির বাণী সংবলিত হিন্দু দর্শন ও জীবনবোধ হতে এই বিপর্যয় বিধ্বস্ত পৃথিবী বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা সংগ্রহ করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের লক্ষ্যে সমন্বয়, সংশ্লেষণ ও ভারসাম্যের আদর্শ বৈদিক অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে, বৈদিক নীতির মাধ্যমে 'শান্তি'র মূল তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠিত বলে তিনি তাঁর বার্তায় বিশেষ উল্লেখ করেছেন। তাঁর প্রেরিত বার্তাটির মূল বাক্যটি হলো—

'Peace will be estblished in world only through Hindu values of life'।